মহাসৌভাগ্য ও মহাদূর্ভাগ্যের গোপন রহস্য

**দি নোব্‌ল কুরআন (মহিমান্বিত কুরআন)**

**পরিশিষ্ট-২**

মূল:

**ড. মুহাম্মাদ তাকীউদ্দিন আল-হিলালী**

**ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন খান**

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, আল-মদীনা আল-মুনাওয়ারাহ

অনুবাদ ও সংকলনে:

**মুহাম্মাদ ইয়াকুব আলী**

**দি নোব্‌ল কুরআন (মহিমান্বিত কুরআন)**

**পরিশিষ্ট-২**

(নবী রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য, আল্লাহ’র একত্ববাদ, একজন মুসলিমের সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি, শির্ক কুফর ও মুনাফিকীর স্বরূপ ও প্রকারভেদ ইত্যাদি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা)

মূল:

**ড. মুহাম্মাদ তাকীউদ্দিন আল-হিলালী**

সাবেক অধ্যাপক, ইসলামী আকিদা শিক্ষা বিভাগ,

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, আল-মদীনা আল-মুনাওয়ারাহ

এবং

**ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন খান**

সাবেক পরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয় হসপিটাল,

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, আল-মদীনা আল-মুনাওয়ারাহ

অনুবাদ ও সংকলনে:

**মুহাম্মাদ ইয়াকুব আলী,** এম.এ. (ইংরেজি, রা.বি.);

ভাইস প্রেসিডেন্ট (অব.), ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড; সাবেক ফ্যাকাল্টি মেম্বার, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমি; সাবেক ম্যানেজার, অগ্রণী ব্যাংক; সাবেক প্রভাষক, ৪টি আধা সরকারি কলেজ; সাবেক পরীক্ষক (ইংরেজি), মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী।

সম্পাদনা:

**মাওলানা কাজী আবু হুরাইরা**

সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি

সাবেক পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, টিভি আলোচক এবং বহু গ্রন্থপ্রনেতা

**… পাবলিকেশন্স**

**দি নোব্‌ল কুরআন (মহিমান্বিত কুরআন)**

**পরিশিষ্ট-২**

**মূল:** ড. মুহাম্মাদ তাকীউদ্দিন আল-হিলালী ও ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন খান

**অনুবাদ ও সংকলনে:** মুহাম্মাদ ইয়াকুব আলী

**প্রকাশক:** মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী

**গ্রন্থস্বত্ব:** মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী

**প্রথম প্রকাশ:**

এপ্রিল ২০২১ খ্রি., রমাযান ১৪৪২ হি., বৈশাখ ১৪২৮ বাংলা।

**মূল্য:** ০/

**প্রাপ্তিস্থান:**

* ইসলামিয়া লাইব্রেরী, রাজশাহী। মোবা: ০১৭১৫০৯৪০৭৭
* ওয়াহিদীয়া লাইব্রেরী, রাজশাহী। মোবা: ০১৭০৮৫২৪৫২৫
* কোরআন মঞ্জিল, রাজশাহী। মোবা: ০১৭১১২০৮০৭১, ০১৮২২৮৮৬১২৪
* বায়তুল মোকাররমের লাইব্রেরিসমূহ, ঢাকা।
* জেলা শহরের ইসলামী লাইব্রেরীসমূহ।
* বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতির জেলা কার্যালয়সমূহ।

**উৎসর্গ**

মার্চ ২০২১, নাসার বরাতে উইকিপিডিয়ার তথ্যানুযায়ী প্রায় ২০ (বিশ) হাজার কোটি গ্যালাক্সির (যার প্রতিটিতে আকৃতি ভেদে এক শত কোটি থেকে দশ হাজার কোটি নক্ষত্র বা সৌরজগত রয়েছে) ও এসবের মধ্যে অদৃশ্য ও দৃশ্যমান অগণিত সৃষ্টির নিপুন স্রষ্টা ও সবকিছুর ধারক, প্রতিপালক, পরিচালক, চিরঞ্জীব সত্ত্বা মহিমান্বিত আল্লাহ’র সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে, সকল মানব ও জ্বিন এবং বিশেষভাবে ২৬.৬৪ কোটির অধিক বাংলা ভাষাভাষী (যারা চীনের হান ও আরবীয় জাতিগোষ্ঠীর পরেই সংখ্যায় পৃথিবীতে তৃতীয় বৃহত্তম নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী) মানুষের শুভ পরিণাম কামনায় এবং আমার স্নেহময়ী মা জননী, আব্বা ও অন্যান্য মৃত প্রিয়জনদের আত্মার মাগফেরাতের জন্য।

বিনীত

মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী

**সূচীপত্র**

[অনুবাদকের কথা 6](#_Toc69291325)

[সম্পাদকের কথা 9](#_Toc69291326)

[এই বইটি যাদের উদ্দেশ্যে অনূদিত ও সংকলিত 10](#_Toc69291327)

[আল্লাহ কেন নবী ও রসূলদের (বাণী/বার্তা বাহক বা দূত) পাঠালেন? 11](#_Toc69291328)

[তাওহীদ - ইসলামী একত্ববাদ 14](#_Toc69291329)

[শাহাদাহ্‌ বা সাক্ষ্য– একজন মুসলিমের স্বীকারোক্তি 28](#_Toc69291330)

[আশ-শির্ক ও আল-কুফর 45](#_Toc69291331)

[আশ-শির্ক (বহু-ঈশ্বরবাদ) 46](#_Toc69291332)

[আল-কুফর (অবিশ্বাস, অস্বীকার, অমান্যতা, অকৃতজ্ঞতা) 54](#_Toc69291333)

[আন-নিফাক (কপটতা বা মুনাফিকী) 58](#_Toc69291334)

[উপসংহার 75](#_Toc69291335)

[গ্রন্থপঞ্জি 81](#_Toc69291336)

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد (ﷺ) وعلى آله وأصحابه و من تبعهم أجمعين.

আসমানের নিচে যমীনের উপরে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান বা ইল্‌ম হলো নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল এবং এর মধ্যে অবস্থিত দৃশ্য ও অদৃশ্যমান সকল সৃষ্টির স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহিমান্বিত আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান বা ইল্‌ম। রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে একদিন জিজ্ঞাসা করা হলো “কোন আমলটি উত্তম?” জবাবে তিনি বললেন, “আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা” (বুখারী হা/২৬, মুসলিম হা/৩৬)। উক্ত হাদীসে নবী (ﷺ) ঈমানকে (যা আল্লাহ্‌ তা'য়ালা সম্পর্কিত জ্ঞানের ভিত্তি) শ্রেষ্ঠ বা সর্বোত্তম আমল বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন।

ইসলামের পাঁচটি মূল ভিত্তির মধ্যে প্রথম হলো ঈমান। ইসলামের সকল বিধান ও কর্মের মধ্যে ঈমানের গুরুত্ব যেমন বেশি তেমনিভাবে সকল ইসলামী জ্ঞানের মধ্যে ঈমান বা আকীদা বিষয়ক জ্ঞানের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। তাই একজন মু'মিনের জন্য অতীব জরুরি হলো বিশুদ্ধ ঈমানের পরিচিতি ও স্বরূপ সম্পর্কে বিশদভাবে অবগত হওয়া এবং তৎসঙ্গে ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি, সেগুলির কারণ ও স্বরূপ সম্পর্কেও বিশদভাবে অবগত হওয়া। এই বিষয়ের জ্ঞান রাখা একজন মু'মিনের দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি ও সফলতার জন্য অপরিহার্য।

সঠিক বিশ্বাসই মানুষের পরিচালিকা শক্তি যা তাকে সফলতা ও সৌভাগ্যের শিখরে তুলে দেয়, তাঁর জীবনে বয়ে আনে অফুরন্ত শান্তি ও আনন্দ। আর ভুল বিশ্বাস বা কুসংস্কার মানুষের মনকে অস্থির ও হতাশ করে ফেলে।

আমরা জানি, বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়ে ইসলাম। সঠিক বিশ্বাস বা ঈমান ইসলামের মূল ভিত্তি। আমরা যত ইবাদত বা সৎকর্ম করি সবকিছু আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে শির্ক-কুফরমুক্ত ঈমান।

মহান আল্লাহ্‌ বলেন, “আর যে ব্যক্তি পারলৌকিক জীবনে কল্যান চায়, আর তার জন্য চেষ্টা করে যতখানি চেষ্টা করা দরকার এবং সে বিশ্বাসী বা মু'মিন হয়, এরাই হল তারা যাদের চেষ্টা সাধনা সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে।” (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত নং ১৯)

الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

“যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলম (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা কেবল তাদের জন্যই এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।” (সূরা আন'আম, আয়াত নং ৮২)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, যারা ঈমান আনার পর তাদের ঈমানকে যুল্‌ম (শির্ক) থেকে মুক্ত রাখবে তারাই হেদায়াত পাবে এবং পরকালের নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু যারা ঈমানের সাথে শির্ক মিশ্রিত করবে কিংবা কুফরি/মুনাফেকিতে লিপ্ত হবে তারা হেদায়াত ও নিরাপত্তা পাবে না। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে মুসলিম সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায়, অধিকাংশ লোকই নিজেদেরকে মুমিন বলে দাবি করলেও তারা নানাভাবে শিরক ও কুফরি কাজে লিপ্ত রয়েছে। এজন্য আমাদেরকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে এবং ঈমানকে হেফাজত করতে হবে। অথচ বাস্তবতা এটাই যে, অধিকাংশ মানুষই ঈমান এবং ঈমান বিনষ্টকারী শির্ক-কুফর ও নিফাক সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখে না।

অন্যত্র ইরশাদ ~~করা~~ হয়েছে- “আর কেউ ঈমান প্রত্যাখান করলে তার কর্ম বিনষ্ট বা নিস্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থদের অর্ন্তভুক্ত হবে।” (সূরা মায়িদা, আয়াত নং ৫)

কোন বিষয়ে বিশ্বাস করতে হলে তাকে আগে সে বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। সেকারনে ঈমান বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করাই জীবনের সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয দায়িত্ব। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্‌ বলেন, “অতএব তুমি জেনে রেখো যে আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন মাবুদ বা উপাস্য নেই।” (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত নং ৯)

(এখানে জেনে রেখো বলতে কালেমা তাইয়্যেবাতে বর্ণিত একত্ববাদ ও রেসালাত সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনকে বুঝানো হয়েছে)

উপরোক্ত বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে মদীনা মনোয়ারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইসলামী আকীদা শিক্ষা' বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ তাকীউদ্দিন আল-হিলালী ও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের পরিচালক ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন খান কর্তৃক যৌথভাবে লিখিত কুর'আনের ইংরেজি অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থ “দি নোব্‌ল কুর'আন” এর পরিশিষ্ট-২ এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ অনুবাদ করা হয়েছে। পরিশিষ্ট বা সংযোজন হবার কারণেই আলোচিত বিষয়বস্তুকে তাঁরা অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছেন। মোটামুটি স্বচ্ছ ধারণা লাভে সহায়ক হবে সে বিবেচনায় **অনূদিত অংশ ঠিক রেখে কয়েকটি বিষয়বস্তুর সঙ্গে কুর'আন, তাফসীর, সহীহ্‌ হাদীস ও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত কিছু অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন করেছি।** আশা করছি পাঠকের জন্য তা খুবই উপকারী বলে বিবেচিত হবে, ইনশাআল্লাহ্‌। পাঠকের কর্মব্যাস্ততা স্মরণে রেখে ও বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় কুরআনের আয়াত ও হাদীসের মূল আরবী উদ্ধৃতি পরিহার করা হয়েছে।

নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ ও শব্দবিন্যাসের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তথাপিও মানুষ হিসাবে লেখার মধ্যে ভুল-ক্রুটি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠক মহলের নজরে কোন ধরণের ভুল-ক্রটি পরিলক্ষিত হলে তা অবহিত করানোর অনুরোধ রইলো।

বিস্তারিত না হলেও বইটিতে যেসব বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে তার দ্বারা পাঠকসমাজ অনেক উপকৃত হবেন আশা রাখি। জেনে-বুঝে সঠিকভাবে ঈমান আনতে এবং নিজেদের ঈমানকে ক্ষতি থেকে হেফাজত করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। এই বইটির মাধ্যমে কোন পাঠক সামান্যতমও উপকৃত হলে বইটির জন্য শ্রম সার্থক হবে ও নাজাতের উসিলা হবে বলে আশা পোষন করছি, ইনশাআল্লাহ্‌।

বইটি সম্পাদনা করেছেন বহু গ্রন্থপ্রনেতা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক পরিচালক ও বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতির সম্মানিত সভাপতি জনাব মাওলানা কাজী আবু হুরাইরা। শাইখের এ মহতি সহযোগীতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। উনিসহ বইটি প্রকাশনার কাজে যাদের সহযোগিতা রয়েছে (কম্পিউটার কম্পোজ, প্রুফ রিভিউ ও ডিজাইনের কাজে সহায়তা করেছে আমার স্নেহের সন্তান মুহাম্মদ ইব্রাহীম জাকি, নূরুদ্দীন মুহাম্মাদ আলী জামি, মাহমুদ আবদুর রহমান তোকি ও খাদিজা তাহেরা) এবং যেসব উলামায়ে কেরামের লেখনী থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে আল্লাহ্‌ তা’আলা যেন সকলকে উত্তম বিনিময় দান করেন এবং এ প্রচেষ্টাকে পাঠকসহ আমাদের, আমাদের পিতা-মাতা ও পরিবারের সকলের জন্য চিরস্থায়ী জগত পরকালে মুক্তির ওসিলা করে দেন এবং আমাদের সকলকে **জান্নাতুল ফিরদাঊসের** মেহমান হিসেবে কবুল করেন। আমীন, আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকল ভূলত্রুটি ক্ষমা করুন ও পূর্ণ মু'মিন হিসেবে কবুল করুন, আমীন। সকলের দোয়াপ্রার্থী।

**-মুহাম্মাদ ইয়াকুব আলী**

রাজশাহী, এপ্রিল, ২০২১

সম্পাদকের বাণী

الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على من لا نبي بعده.

দি নোব্‌ল কুরআন (মহিমান্বিত কুরআন) পরিশিষ্ট-২ এর সম্মানিত লেখকদ্বয় ড. মুহাম্মাদ তাকীউদ্দিন আল-হিলালী ও ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন খান গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তারা পুরো কুরআনুল কারীমের ইংরেজি অনুবাদ শেষে পরিশিষ্ট আকারে শাহাদাহ, তাওহীদ, শিরক, কুফর ও নিফাক সম্পর্কে কোরআন ও হাদিসের সূত্রসহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী দিয়েছেন। সেই সাথে সম্মানিত অনুবাদক জনাব মুহাম্মাদ ইয়াকুব আলী প্রত্যেকটি বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় আয়াত ও হাদিস সংযোজন করে প্রতিটি বিষয়কে আরো সমৃদ্ধ করেছেন।

আমার মত নগন্য ব্যক্তিকে তিনি বইটি সম্পাদনা করার দায়িত্ব দেওয়ায় আমি বিস্মিত হয়েছি। কারণ তাঁর প্রজ্ঞা ও গভীর জ্ঞান দিয়ে বইটি শুধু অনুবাদই করেননি, বরং একইসঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে যেসব কোরআন ও হাদীসের যেসব উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে বইটি বুঝা ও জানার জন্য খুবই সহজতর হবে। আর যে দুজন মূল কুরআনের ইংরেজি ভার্সন ও টীকা লিখেছেন তারা বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ ইসলামী স্কলার।

মুসলিম সমাজে নামায, রোজা, দোয়া-দরুদ নিয়ে কিছু চর্চা করলেও ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো তথা তাওহীদ, শিরক, কুফর ও নিফাক সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও বাস্তব জ্ঞান খুব কম মুসলমানের রয়েছে। অত্যন্ত নিখুঁতভাবে অত্র পুস্তকে এই কয়টি বিষয়ের পর্যাপ্ত আয়াত ও হাদীস এবং সেগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বইটি আদ্যপান্ত পড়ে এবং প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে মনে হয়েছে যে এই বইটি আমাদের সকল মুবাল্লিগ, দায়ী ইলাল্লাহ এবং খতিব ও ইমামগণের জন্য রেফারেন্স বুক হিসেবে একটি মূল্যবান সম্পদ হবে।

আশা করি সকল ওলামায়ে কেরাম তো বটেই, বইটি প্রত্যেক মুসলিমের ঘরে থাকলে ইসলামের এই মৌলিক বিষয়সমূহ এবং ইহ ও পরকাল সম্পর্কে পরিবারের সদস্যগণ এবং তাদের পরের প্রজন্মের জন্য একটি নির্ভেজাল খাঁটি চিন্তাধারার সূচনা করতে তারা সক্ষম হবে। পাঠ্যসূচির বোঝা রপ্ত করতে ক্লাস, প্রাইভেট, কোচিং ও পরীক্ষা ইত্যাদির পরে আমাদের সন্তানদের পক্ষে আলাদা সময় বের করে নিজেরা বা ব্যস্ত অভিভাবকদের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ এই বইয়ের শিক্ষা গ্রহণ বা প্রদান বাস্তবে হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কম, বিধায় বইটি জাতীয় পাঠ্যক্রমের আওতাভুক্ত করে সরকারি বেসরকারি সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জাতীয় শিক্ষাক্রমে এই বইটি যুক্ত হলে শিক্ষার্থীরা জীবন গঠনের শুরুতেই এবিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞানলাভে সক্ষম হবে।

মহান আল্লাহ সংশ্লিষ্ট সকলকে খাঁটি ঈমান ও কর্মময় জীবনের তৌফিক দান করুন। আমীন।

-মাওলানা কাজী আবু হুরাইরা

সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি

এই বইটি যাদের উদ্দেশ্যে অনূদিত ও সংকলিত

**১. যারা স্রষ্ট্রাকে সঠিকভাবে চিনতে চান:** মানবজাতির মধ্যে যারা এই পৃথিবীর বিশাল প্রান্তর অতিক্রম করে চলেছেন, কিন্তু তারা তাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের (যিনি তাকে মাতৃগর্ভের সংকীর্ণ পরিসরে ত্রিবিধ অন্ধকারে সৃষ্টি করে না চাইতেই তার সকল প্রয়োজন পূরণ করে, মানবাকৃতি দান করে, মাতৃগর্ভরূপ জাহাজ থেকে বিশাল পৃথিবী পৃষ্ঠে নামিয়ে দিয়েছেন) কোনো খোঁজ-খবরও রাখেননি।

**২. যারা জীবনে শান্তি পেতে চান:** যারা মণকে মণ, টনকে টন বই কিতাব পাঠ করে বহু ডিগ্রী ও পদ পদবী অর্জন করেছেন, কিন্তু উক্ত পুস্তিকার মাত্র কয়েক পৃষ্ঠায় বর্ণিত জ্ঞান ও বিশ্বাসের অভাবে মহিমান্বিত প্রভু আল্লাহ্‌র সর্বব্যাপী বিধানের বাইরে অমুসলিম রয়ে গেছেন, মুসলিম অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী হয়ে মানবিক দুঃখ-কষ্ট-বেদনার মধ্যেও একজন মু’মিন ব্যক্তির মত কল্যাণ ও শান্তি লাভ করতে পারেননি।

**৩. যারা অনন্ত জীবনে মহাভাগ্যবান হতে চান:** মহাসমুদ্রে একটি সুচ ডুবালে তার মাথায় ধারণকৃত বারি বিন্দুর মত ক্ষুদ্র এই মানব জীবনের বিদায় লগ্নে নিরাপত্তার আশ্বাস এবং পরে যারা চিরস্থায়ী পরজগতে অন্তর যা চায় এবং মন যা দাবি করে- সে সবকিছু পেয়ে মহাভাগ্যবান হতে চান (সূরা হা-মীম সাজদাহ্, আয়াত নং ৩০-৩২ দ্রষ্টব্য এবং যে ওয়াদা সত্য ও বাস্তব, যা পৃথিবীর কোন সংবাদ সংস্থা যেমন-বিবিসি, সিএনএন বা ভয়েস অফ আমেরিকার দেয়া তথ্যের মত নয় যা অনেকসময় ভূল, মিথ্যা, পক্ষপাতদুষ্ট ও অনির্ভরযোগ্য হয়) তাঁদের জন্য।

**৪. যারা পরকালীন জীবনে নিরাপত্তা চান:** “আর আপনি যদি দেখতেন তখনকার অবস্থা যখন ফিরিশতাগণ অবিশ্বাসীদের মুখমন্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাদের প্রাণ হরণ করছে এবং বলছে, তোমরা দহন যন্ত্রণা (আগুনের) ভোগ করো।” (সূরা আনআম, আয়াত নং ৫০) যারা মৃত্যুকালীন উক্ত শাস্তি এবং তার পরে কবরের ও জাহান্নামের আযাব থেকে নিরাপত্তা কামনা করেন- তাঁদের জন্য।

**৫. যারা নিজেদের ঈমানকে নবায়ন করতে চান:** রসূলুল্লাহ্‌ (ﷺ) বলেন, “তোমরা তোমাদের ঈমানকে নবায়ন কর।” জিজ্ঞাসা করা হলো, ”কিভাবে আমরা আমাদের ঈমানকে নবায়ন করবো?” রসূলুল্লাহ্‌ (ﷺ) বললেন, “তোমরা বলো, ‘লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্’।” (মুসতাদরাক হাকেম) -যারা সজ্ঞানে নিজেদের ঈমান নবায়ন করতে চান তাঁদের জন্য।

**৬. যারা সমাজ সংস্কারক হয়ে মানুষের আত্নশুদ্ধি আনার মাধ্যমে সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব পেতে চান:** যে জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসের অভাবে পরিবারের আপনজন থেকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিথ্যা প্রতারণা, আমানতের খিয়ানত, ওয়াদা অঙ্গীকার ও চুক্তি ভঙ্গ, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন, ঘুষ, দুর্নীতি, অন্যের অর্থ-সম্পদ আত্মসাত ও ফলশ্রুতিতে কলহ-বিবাদ মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে অগণিত মানুষ ক্রমাগত অশান্তির আগুনে জর্জরিত, শোষিত ও নিস্পেষিত। যারা নিজ নিজ অবস্থান/কর্মক্ষেত্র থেকে দ্বীনের পথে দা’য়ী (আহবানকারী) ও সমাজ সংস্কারক হিসাবে উক্ত জ্ঞানের ধারক ও প্রচারক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে ও সদকায়ে জারিয়ার (বহমান দান) সওয়াব (প্রতিদান, পুরস্কার) লাভে মহা ভাগ্যবান হতে চান; তাদের জন্য (এর চাইতে উত্তম কোন জনকল্যাণ/ সমাজ সংস্কারের কাজ আর কিই বা হতে পারে?)।

আল্লাহ কেন নবী ও রসূলদের (বাণী/বার্তা বাহক বা দূত) পাঠালেন?

যখন থেকে মানুষ শির্‌কের (আল্লাহর সাথে অন্যান্যদের তথা স্রষ্ঠার সাথে সৃষ্ঠজীবের উপাসনা/পূজা-অর্চনার) প্রবর্তন করে, তখন থেকে আল্লাহ তাঁর ভক্তদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহবান জানানোর জন্য আল্লাহর কোন অংশীদার সাব্যস্ত না করার নির্দেশ দিতে এবং তাদেরকে বহুত্ববাদের অন্ধকার থেকে বের করে একত্ববাদের আলোর দিকে নিয়ে আসতে নবী ও রাসূলদের (বাণীবাহক, বার্তাবাহক বা সংবাদ বাহক) পাঠাতে থাকেন। সমস্ত নবীগণ তাওহীদের বাণী (অর্থাৎ একত্ববাদ, মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস) প্রচার করেছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ তার উদাহরণ:

“আমি তো নূহকে পাঠাইয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন ইলাহ্ নাই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করিতেছি।” (সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ৫৯)

“আদ জাতির নিকট আমি উহাদের ভ্রাতা হূদকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তোমরা কি সাবধান হইবে না?” (সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ৬৫)

“সামূদ জাতির নিকট তাহাদের ভ্রাতা সালিহকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে। আল্লাহর এই উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। ইহাকে আল্লাহর জমিতে চরিয়া খাইতে দাও এবং ইহাকে কোন ক্লেশ দিও না, দিলে মর্মন্তুদ শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হইবে।” (সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ৭৩)

“আমি মাদয়ানবাসীদের নিকট তাহাদের ভ্রাতা শু'আয়বকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে, লোকদেরকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাইবে না; তোমরা মু'মিন হইলে তোমাদের জন্য ইহা কল্যাণকর।” (সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ৮৫)

“আল্লাহর ইবাদাত করিবার ও তাগূতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রসূল পাঠাইয়াছি। অতঃপর উহাদের কতককে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহাদের কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হইয়াছিল; সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদের পরিণাম কি হইয়াছে!” (সূরা নাহল, আয়াত নং ৩৬)

প্রত্যেক নবী তাঁর নিজ জাতি-গোষ্ঠিকে পথ প্রদর্শনের (হেদায়াতের) জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, কিন্তু নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বার্তা ছিল সাধারণভাবে সকল মানব ও জ্বিন জাতির জন্য। যেমন সূরা আ'রাফে আল্লাহ তাঁর রসূলকে সম্বোধন করে বলেন, -

“বল, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসূল, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁহার বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি; যে আল্লাহ ও তাঁহার বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তাহার অনুসরণ কর, যাহাতে তোমরা সঠিক পথ পাও।” (সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ১৫৮)

সুতরাং জিন ও মানবের নিকট এই সব নবী রাসূল পাঠানোর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে তারা শুধু আল্লাহর ইবাদাত/উপাসনা করবে। যেমন আল্লাহ বলেন-

“আমি সৃষ্টি করিয়াছি জিন এবং মানুষকে এইজন্য যে, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে।” (সূরা যারিয়াত, আয়াত নং ৫৬)

আল্লাহর ইবাদাত করার অর্থ হলো তাঁর আনুগত্য করা এবং যা কিছু তিনি করার নির্দেশ দিয়েছেন তা করা, একইসঙ্গে তাঁকে ভয় করা, তিনি যেসব করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। শুধুমাত্র তখনই যারা তাঁর আনুগত্য করবে তাদেরকে তিনি জান্নাতে পাঠিয়ে পুরস্কৃত করবেন, আর যারা তাঁকে অমান্য করবে তাদেরকে নরকাগ্নিতে/জাহান্নামে পাঠিয়ে শাস্তি প্রদান করবেন।

তাওহীদ - ইসলামী একত্ববাদ

তাওহীদের (ইসলামী একত্ববাদ) ৩ টি রূপ:

**ক) আল্লাহর প্রভুত্বের একত্ববাদ যা আরবীতে তাওহীদ-উর-রবুবিয়্যাহ:** বিশ্বাস করা যে সমগ্র বিশ্বের একজনই প্রভু বা প্রতিপালক যিনি ইহার স্রষ্টা, সংগঠক, পরিকল্পনাকারী, ধারণকারী, পরিপোষণকারী এবং নিরাপত্তাদানকারী এবং তিনিই আল্লাহ।

**খ) আল্লাহর ইবাদতে একত্ববাদ যা আরবীতে তাওহীদ-আল-উলুহিয়্যাহ:** বিশ্বাস করা যে আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপাসনা বা পূজা অর্চনা (প্রার্থনা, যাঞ্চা, অদৃশ্যের সাহায্য পাবার আকুতি, শপথ, মানত, কুরবানী, দান-সদকা, উপবাস/রোজা, হজ্জ্ব করা) পাবার অধিকার নেই। (যেহেতু তিনিই এই মহাবিশ্ব এবং এর মধ্যস্থ দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সব কিছুর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, ধারণকারী ও নিরাপত্তা দাতা-অনুবাদক)।

**গ) আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদ যা আরবীতে তাওহীদ-আল -আসমা ওয়াস সিফাত:** বিশ্বাস করা যে,

১) আমরা আল্লাহর জন্য কোন নাম ও গুণাবলী আরোপ করবো না, তিনি এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) প্রদত্ত তাঁর নাম ও গুণাবলী ছাড়া।

২) আল্লাহর নাম ও গুণাবলী অন্য কারও প্রতি আরোপ করা যাবে না; যথা: আল-কারীম (মহাসম্মানিত)। (এ ধরনের উপাধি শুধুমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্ঠজীবের হতে পারে না -অনুবাদক)।

৩) আল্লাহ তাঁহার কিতাবে (আল-কুরআনে) এবং তাঁর রাসূলের (মুহাম্মদ ﷺ) মাধ্যমে তাঁর যেসব গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন সে সকল নাম ও গুণাবলীতে কোন প্রকার পরিবর্তন, বিকৃতি, অপব্যাখ্যা ছাড়া, এবং যাহা কোন সৃষ্টিজীবের গুনের মত নয়, তুলনীয় নয় বা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় জেনে আমরা তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবো। যথা কুরআনে উল্লিখিত, আল্লাহ তাঁহার আরশে সমাসীন। (সূরা ত্ব’হা, আয়াত নং ৫)

“পরম দয়াময় (আল্লাহ) আরশে সমাসীন” (যে ভাবে তাঁর মাহাত্বের সাথে শোভনীয়) যা সপ্তাকাশের উপর; এবং আরাফার দিনে (জ্বিলহজ্জ মাসের ৯ম দিবসে) তিনি আমাদের (নিকটবর্তী) ১ম আসমানে অবতরণ করেন এবং রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে ও যেমন নবী (ﷺ) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর জ্ঞানের (ও শক্তির) মাধ্যমে আমাদের সাথেই আছেন, তাঁর ব্যক্তিগত সত্ত্বা বা জাতসহ নয় (এটা সেরূপ নয় যেমন কিছু লোক মনে করে এখানে সেখানে সর্ব জায়গায় এমনকি মানবের বক্ষস্থিত অন্তরেও রয়েছেন)। আল্লাহ আরও বলেন, ”কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।” (সূরা আশ-শুআ’রা, আয়াত নং ১১)

এই আয়াত কোন সৃষ্ট বস্তুর সাথে কোন প্রকার তুলনা বা সাদৃশ্য ছাড়াই আল্লাহর দর্শন ও শ্রবণশক্তির গুণাবলী প্রমান করে। একইভাবে আল্লাহ আজ্ঝা ওয়া জ্বাল) (عز و جل আরও বলেন,

“যাকে আমি নিজ উভয়হস্তে সৃষ্টি করিয়াছি।” (সূরা সাদ, আয়াত নং ৭৫)

এবং তিনি আরও বলেন, “তাদের হাতের উপরে আছে আল্লাহর হাত।” (সূরা আল-ফাত্হ, আয়াত নং ১০)

এটা আল্লাহর দুটি হাত নিশ্চিত করে, কিন্তু মূলত তাদের (দুটি হাতের) কোন সাদৃশ্য নাই। এটাই সকল প্রকৃত মুমিনদের (বিশ্বাসীদের) বিশ্বাস এবং এটা নূহ, ইব্রাহিম, মূসা, ঈসা থেকে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর বিশ্বাস।

তাওহীদের এই তিন রূপ”লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত/ উপাসনা পাবার অধিকার নেই)” এই অর্থের মধ্যে শামিল আছে।

আল্লাহর রসূলের (বার্তাবাহক) অনুসরণ করা অপরিহার্য যাকে আরবীতে ঊযুব আল ইত্তিবা বলে, ইহা তাওহীদ আল-উলুহিয়্যার একটি অংশ। এটা “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রসূল” এর অর্থের মধ্যে শামিল এবং ইহার অর্থ”আল্লাহর কিতাবের (কুরআন) পর আল্লাহর রসূল ছাড়া আর কাহারও অনুসরণ/আনুগত্য পাবার অধিকার নেই।”

আল্লাহ বলেন, “এবং রসূল (মুহাম্মদ ﷺ) তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।” (সূরা আল-হাশর, আয়াত নং ৭)

এবং আল্লাহ আরও বলেন, “বলুন (হে মুহাম্মাদ), হে মানবজাতি তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ কর (ইসলামের তাওহীদ গ্রহণ কর এবং কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ কর), আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ৩১)

অনুবাদকের সংযোজন[[1]](#footnote-1)

শাহাদাহ্‌ বা সাক্ষ্য– একজন মুসলিমের স্বীকারোক্তি

একজন মুসলিমের ধর্মীয় বিশ্বাসের ঘোষণাপত্র বা স্বীকারোক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ’ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর বার্তাবাহক বা রসূল।

**এটা লক্ষ্য করা হয়েছে যে, মানবজাতির মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁদের অধিকাংশই ইসলামের প্রথম মৌলিক নীতি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর বার্তাবাহক বা রসূল” এর অর্থের প্রকৃত বাস্তবতা বুঝেন না। সুতরাং এই মহান কালেমার (বাক্যের) কিছু অর্থের কিছুটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা আমি অপরিহার্য বিবেচনা করছি**: ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ’ অর্থাৎ ‘আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর বার্তাবাহক বা রসূল’ এর তিনটি রূপ: ক, খ এবং গ।

**ক)** এটা হলো মহীয়ান গরিয়ান আল্লাহ, যিনি সপ্তাকাশ ও জমিনের স্রষ্টা এবং অস্তিত্বশীল সকল কিছুর শাসক, তাঁর সাথে সম্পাদিত ৪ (চার) দফার একটি ঐকান্তিক অঙ্গীকারনামা যা নিছক কোন প্রতিজ্ঞা নয়।

**১ম দফা:** আপনার অন্তর/হৃদয় দিয়ে এই স্বীকারোক্তি করা যে সকল বস্তুর স্রষ্টা আল্লাহ; এটা এই যে আপনাকে বলতে হবে:”গ্রহ নক্ষত্রসমূহ, সূর্য, চন্দ্র, আকাশমন্ডলী ও জমিন এবং ইহাদের মধ্যস্থিত সকল প্রকার জ্ঞাত ও অজ্ঞাত জীবনের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ। তিনিই ইহাদের সকল প্রকারের সংগঠক ও পরিকল্পনাকারী। তিনিই জীবন ও মৃত্যুদাতা এবং তিনিই (এককভাবে) প্রতিপালক এবং নিরাপত্তাদাতা।” এবং এটাকেই বলা হয় (আপনার স্বীকারোক্তি) আল্লাহর প্রভুত্বের একত্ববাদ বা আরবীতে তাওহীদ-উর-রবুবিয়্যাহ।

**২য় দফা:** আপনার হৃদয় / অন্তর থেকে স্বীকারোক্তি করা যে: “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য বা ইলাহ নেই।” ইসলামী পরিভাষায় উপাসনা বা পূজা অর্চনা (অর্থাৎ ইবাদত) শব্দটি বহুবিধ অর্থজ্ঞাপক: এটা এই অনুভূতি জ্ঞাপন করে যে সর্বপ্রকার উপাসনা / ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য (এবং অপর কাহারও জন্য নয়, হোক সে ফেরেশতা বা স্বর্গীয় দূত, রসূল বা বার্তাবাহক, মারিয়াম পুত্র নবী ঈসা (আ:), উজাইর (ইজরা), মুহাম্মদ (ﷺ), সাধু-সন্ত, মূর্তি, সূর্য, চন্দ্র এবং সকল প্রকার মিথ্যা দেবদেবীসমূহ)। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া আর কারও নিকট দু’আ বা যাচনা করো না, আল্লাহ ছাড়া অদৃশ্য কারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো না, আল্লাহ ছাড়া আর কারও নামে শপথ করো না এবং কোন পশু কুরবানী করো না ইত্যাদি - যার অর্থ আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহক মুহাম্মদ (ﷺ) যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন (কুরআন ও সুন্নাহতে) আপনি তা অবশ্যই করবেন এবং যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর রসূল নিষেধ করেছেন, আপনি তা অবশ্যই করবেন না। এটাকে বলা হয় (আপনার স্বীকারোক্তি) ইবাদত বন্দেগীতে আল্লাহর একত্ববাদ -- আরবীতে তাওহীদ-আল-উলুহিয়্যাহ। সুতরাং আপনারা (হে মানবজাতি) আল্লাহ ছাড়া আর কারও পূজা উপাসনা করবেন না।

**৩য় দফা:** আপনার হৃদয় থেকে এ স্বীকারোক্তি যে, ”হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, যেসব উত্তম নামসমূহ ও পূর্নাঙ্গ গুণাবলীতে আপনি নিজেকে আপনার কিতাবে (অর্থাৎ কুরআনে) ভূষিত করেছেন অথবা আপনার নবী মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর বর্ণনায় যেসব নামে ও গুণাবলীতে আপনাকে ভূষিত করেছেন, আমি বিশ্বাস করি এগুলি (নামসমূহ ও গুণাবলী) অর্থের কোন পরিবর্তন ছাড়া অথবা এগুলি সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে / অবহেলা করে বা অন্য কিছুর সঙ্গে সেগুলির সাদৃশ্য নির্ণয় করা ছাড়াই।”

যেমন আল্লাহ বলেন, “কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সব শোনেন, সব দেখেন” (সূরা আশ-শুআ’রা, আয়াত নং ১১)

এই আয়াত কোন সৃষ্ট বস্তুর সাথে কোন প্রকার তুলনা বা সাদৃশ্য ছাড়াই আল্লাহর দর্শন ও শ্রবণ শক্তির গুণাবলী প্রমান করে। তিনি আরও বলেন,

“যাহাকে আমি নিজ উভয় হস্তে সৃষ্টি করিয়াছি।” (সূরা সাদ, আয়াত নং ৭৫)

তিনি আরও বলেন, “তাদের হাতের উপরে আছে আল্লাহর হাত।” (সূরা-আল-ফাত্হ, আয়াত নং ১০)

এটা আল্লাহর জন্য দুটি হাত নিশ্চিত করে কিন্তু তাদের কোন সাদৃশ্য নাই।

অনুরূপ আল্লাহ বলেন, “পরম দয়াময় (আল্লাহ) আরশে সমাসীন (যেভাবে তাঁর মাহাত্ম্যের সাথে শোভনীয়)।” (সূরা ত্ব-হা, আয়াত নং ৫)

সুতরাং তিনি বাস্তবেই তাঁর সিংহাসনে (আরশে) সমাসীন হয়েছেন যেভাবে তাঁর মাহাত্ম্যের সাথে শোভনীয়।

এবং আল্লাহ সপ্তাকাশের উপরে তাঁর সিংহাসনে সমাসীন আছেন, যেমন এক ক্রীতদাসী বালিকাকে আল্লাহর রসূলের (ﷺ) এর প্রশ্ন “আল্লাহ কোথায়” এর জবাবে সে আকাশের দিকে উদ্দিষ্ট করে দেখায়।

তিনি প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে নিকটবর্তী আকাশে আমাদের নিকটে অবতরণ করেন এবং আরাফার দিনেও (জ্বিলহজ্জ মাসের ৯ম তারিখে) যেমনটি নবী মুহাম্মদ (ﷺ) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর সত্ত্বাসহ নয় বরং জ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের সাথেই আছেন। এটা সেরূপ নয় যেমন কিছু লোক মনে করে যে আল্লাহ এখানে সেখানে সব জায়গায় এমনকি মানবের বক্ষস্থিত অন্তরেও আছেন।

আমরা যা কিছু করি বা বলি তিনি সবই দেখেন ও শুনেন এবং এটাকেই (আপনার স্বীকারোক্তি) আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীতে তাঁর একত্ববাদ বলে - আরবীতে তাওহীদ-আল-আসমা-ওয়াস-সিফাত। এবং এটাই সঠিক আক্বিদা বা বিশ্বাস, যে বিশ্বাসের অনুসারী ছিলেন আল্লাহর নাবীগণ (নূহ, ইব্রাহিম, মুসা, দাউদ, সুলাঈমান, ঈসা থেকে মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবীগণ) এবং এসব নাবীগণের সৎকর্মপরায়ণ অনুসারীগণ।

**৪র্থ দফা:** আপনার হৃদয় দিয়ে এ স্বীকারোক্তি করা: “হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ (ﷺ) আপনার বাণীবাহক বা বার্তাবাহক (রসূল)।” যার অর্থ, যেহেতু মুহাম্মদ (ﷺ) সর্বশেষ রসূল সেহেতু আল্লাহর পরে মুহাম্মদ (ﷺ) ছাড়া আর কারও আনুগত্য পাবার অধিকার নেই। যেমন আল্লাহ বলেন,

“মুহাম্মদ (ﷺ) তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।” (সূরা আহযাব, আয়াত নং ৪০)

“এবং রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক।” (সূরা হাশর, আয়াত নং ৭)

“এবং আল্লাহ বলেন, বলুন (হে মুহাম্মদ, মানব জাতিকে বলুন), তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ কর (অর্থাৎ ইসলামের একত্ববাদ বা তাওহীদকে গ্রহণ কর এবং কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ কর)।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ৩১)

**মুহাম্মদ (ﷺ) ছাড়া অন্যান্যদের ব্যাপারে তাদের বর্ণনা আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও রসূলের সুন্নাহ (বৈধ আইনসম্মত বিষয়াদি, নির্দেশনা, ইবাদত, বর্ণনা) অনুরূপ কিনা, সে আলোকে গৃহীত বা প্রত্যাখ্যাত হবে।**

যেহেতু নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর মৃত্যুর পর থেকে আসমানী প্রত্যাদেশ বা ওহী অবতীর্ণ হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে এবং মরিয়ম পুত্র ঈসার (যীশুর) অবতরণ সময়কালে ছাড়া তা আর পুনরায় শুরু হবে না এবং সহীহ হাদীসের বর্ণনামতে (নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর বর্ণনা সহীহ বুখারী খন্ড নং - ৩, হাদীস নং ৪২৫) তিনি (যীশু) পৃথিবীর শেষ দিনগুলিতে ইসলামী আইনানুসারে ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন।

**খ)** এটা উচ্চারণ করা অপরিহার্য: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপাসনার বা উপাস্য হবার অধিকার নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর বার্তাবাহক/সংবাদবাহক বা রসূল)। যেহেতু এটা নবী মুহাম্মদ (ﷺ) এর চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর সময় তার নিকট নবীজির বর্ণনা / বক্তব্য হিসেবে এসেছে: হে চাচা; যদি আপনি মনেপ্রাণে এটা বলেন / উচ্চারণ করেন (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ - আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর বার্তাবাহক), তাহলে কিয়ামত দিবসে আমি আল্লাহর সম্মুখে আপনার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করতে সক্ষম হব। একইভাবে যখন আবু যর গিফারী ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি মসজিদে হারামে যান এবং কুরাইশ কাফেরদের সামনে তা উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে থাকেন যাবৎ না তাকে নিষ্ঠূরভাবে প্রহার করা হয়।

**গ)** এটা অপরিহার্য যে কারও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং তাঁর দেহের অন্যান্য অংশ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইহার সাক্ষ্য দিবে এবং ইহার অর্থের ব্যাপারে ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ (অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর অর্থ - আল্লাহ ছাড়া কারও উপাস্য হবার অধিকার নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর বার্তাবাহক)।

সুতরাং যে কেউ এটার স্বীকারোক্তি করেছে (তার প্রভুর নিকটে) সে কোন পাপাচারে লিপ্ত হবে না যেমন - চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ব্যাভিচার, শূকর মাংস ভক্ষণ, মদ্য পান, এতিমের সম্পদে অবৈধ সুবিধা গ্রহণ, ব্যবসায়ে প্রতারণা, ঘুষ এবং অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জন, মিথ্যাচার, গীবত অন্যথায় তার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অন্যান্য দেহাংশ আল্লাহর নিকটে তার কৃত অঙ্গীকারে সে মিথ্যুক ছিল বলে সাক্ষ্য দিবে। যদি সে উপরোক্ত পাপাচারে লিপ্ত হয় তবে তার জানা দরকার যে এসব এমন পাপ যার জন্য তার অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে যেহেতু তার দেহের অঙ্গসমূহ (অর্থাৎ চর্ম, গোপনাঙ্গসমূহ, হাত, জিহবা, কানসমূহ) তার উপরোক্ত অপরাধের (আমলসমূহের) জন্য তার বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিবসে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

এবং **এই মহান কালেমার (অর্থাৎ নীতিবাক্য) স্বীকারোক্তির সঙ্গেই কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে।** তদানুসারে আল্লাহর সমস্ত নবীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য না করা তার জন্য অপরিহার্য। যেহেতু এটা তাঁর (আল্লাহর) কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে। **আল্লাহ বলেন,**

“যারা কুফরী করেছে তারা কি মনে করেছে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? নিশ্চয় আমি জাহান্নামকে কাফিরদের আপ্যায়নের (তথা শাস্তির) জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি।”

“বলুন (হে মুহাম্মদ) ‘আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দিব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত?” তারাই সেসব লোক যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে ব্যর্থ হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে করেছে যে তারা সৎকর্মই করেছে। “তারাই সেসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী\*\* এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের সকল আমল নিস্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য কোন ওজনের ব্যবস্থা রাখব না। জাহান্নাম-এটাই তাদের প্রতিফল; কারণ, তারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয় রূপে গ্রহণ করেছে। **নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের মেহমানদারির (অভ্যর্থনার) জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস। যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তারা সেখান থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হতে চাইবে না।** [হে মুহাম্মদ (ﷺ)] মানবজাতিকে বলুন, আমার পালনকর্তার কথা লেখার জন্য যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও। বলুন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ (উপাস্য)। অতএব, **যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।”** (সূরা কাহাফ, আয়াত নং ১০২-১১০) [\*\* প্রমাণসমূহ, সাক্ষ্যপ্রমান, আয়াতসমূহ, উপদেশ, লক্ষণাদি ও বিষ্ময়কর গুপ্ত বিষয়ের প্রকাশ ইত্যাদি]

**যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে চায় তার জন্য এই ভূমিকার (উপরোক্ত জ্ঞান) একান্ত প্রয়োজন। এই স্বীকারোক্তির পর তার (নারী বা পুরুষ) উচিৎ গোসল করা এবং তারপর দু'রাকাত সালাত আদায় করা এবং বুখারী শরীফের ১ম খন্ডের ৭নং হাদীসে ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত ইসলামের ৫ (পাঁচ) টি স্তম্ভের উপর আমল করা। ইবনে ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: ইসলাম পাঁচটি নিম্নোক্ত ভিত্তি/স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত:**

**১. এই সাক্ষ্য দেয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপাস্য হবার অধিকার নাই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রসূল বা বার্তাবাহক বা দূত**

**২. সালাত আদায় করা**

**৩. যাকাত প্রদান করা**

**৪. হজ্জ্ব করা (অর্থাৎ মক্কায় তীর্থযাত্রা করা)**

**৫. রামাজান মাসে সাওম (রোজা) রাখা**

**এবং অবশ্যই ঈমানের ৬ টি ভিত্তির উপর বিশ্বাস রাখা অর্থাৎ বিশ্বাস করা:**

**১. আল্লাহর উপর, ২. তাঁর ফেরেশতাদের উপর, ৩. তাঁর রসূলগণের উপর, ৪. তাঁর অবতীর্ন কিতাবসমূহে, ৫. পুনরুত্থান (কিয়ামত) দিবসের উপরে এবং ৬. তাকদীরে (আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীর অর্থাৎ ভাগ্যের ভালো এবং মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তা অবশ্যই সংঘটিত হবে)।**

**গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ দেয়ার বিষয়:**

**সৎকর্ম কবুল হওয়া নিম্নের দু'টি মৌলিক শর্তের উপর নির্ভরশীল** যা অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে:-

১. এরূপ কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্য হতে হবে সম্পূর্ণ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে - কোন প্রকার লোক দেখানো (বা শোনানো), খ্যাতি বা প্রশংসা অর্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া।

২. এরূপ আমল অবশ্যই আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ যিনি সকল নবী ও রসূলদের সর্বশেষ নবী ও রসূল, তাঁর সুন্নাত (আইন সম্মত নির্দেশ, ইবাদত, বর্ণনা) মোতাবেক সম্পাদিত হতে হবে।

অনুবাদকের সংযোজন[[2]](#footnote-2)

আশ-শির্ক ও আল-কুফর

**বহুত্ববাদ এবং অবিশ্বাস, অস্বীকার, অমান্যতা, অকৃতজ্ঞতা**

আল্লাহর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় পাপ থেকে সমগ্র মানবজাতির পরিত্রাণ

সবচেয়ে বড় পাপ যা আল্লাহ কখনও ক্ষমা করবেন না সে সম্পর্কে কিছু খুঁটিনাটি তথ্য এখানে উল্লেখ করা অপরিহার্য। এই ক্ষমার অযোগ্য পাপ হলো শির্ক।

শির্ক ইঙ্গিত করে আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার আরোপ করা বা আল্লাহ ছাড়াও অন্যান্যদের প্রতি ঐশ্বরিক বা খোদায়ী গুণাবলী আরোপ করা এবং বিশ্বাস করা যে, শক্তির উৎস, ক্ষতি এবং আশীর্বাদ বা দান আল্লাহ ছাড়াও অন্যান্যদের কাছ থেকে আসে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁহার সঙ্গে ইবাদতে শরীক করা ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; এবং যে কেহ আল্লাহর ইবাদতে শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।” (সূরা নিসা, আয়াত নং ৪৮)

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, “এবং যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্নীয়তার বন্ধন থাকিবে না, এবং একে অপরের খোঁজ-খবর লইবে না, এবং যাহাদের পাল্লা (সৎকাজের) ভারী হইবে তাহারাই হইবে সফলকাম, এবং যাহাদের পাল্লা (সৎকাজের) হালকা হইবে তাহারাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে; উহারা জাহান্নামে স্থায়ী হইবে। অগ্নি উহাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করিবে এবং উহারা সেখানে থাকিবে বীভৎস চেহারায়; (বলা হবে) তোমাদের নিকট কি আমার আয়াত আবৃত্তি করা হইত না? অথচ তোমারা সেই সকল অস্বীকার করিতে। উহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পাইয়া বসিয়াছিলো এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। 'হে আমাদের প্রতিপালক! এই অগ্নি হইতে আমাদেরকে উদ্ধার কর; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় পাপাচারে লিপ্ত হই তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী (বহু-ঈশ্বরবাদী, অত্যাচারী, অন্যায় এবং অপকর্ম কারী) হইব।' আল্লাহ বলিবেন, 'তোরা হীন অবস্থায় এইখানে থাক এবং আমার সঙ্গে কোন কথা বলিস না।” (সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত নং ১০১-১০৮)

“যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে ডাকে অন্য ইলাহ্‌ (উপাস্যকে) কে, এই বিষয়ে তাহার নিকট কোন সনদ বা প্রমাণ নাই; তাহার হিসাব প্রতিপালকের নিকট আছে। নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকাম হইবে না।” (সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত নং ১১৭)

আশ-শির্ক (বহু-ঈশ্বরবাদ)

**বহু ঈশ্বরবাদ এবং ইহার প্রকাশিত নানারূপ**

**সংজ্ঞা:** শির্ক মূলত বহু-ঈশ্বরবাদ অর্থাৎ আল্লাহর সাথে সাথে অন্যান্যদের উপাসনা বা ইবাদত। ইহা আল্লাহ্‌ ছাড়াও অন্যান্যদের প্রতি ঐশ্বরিক গুনাবলী আরোপ করার বিষয়ে ইঙ্গিত করে। ইহা বিশেষ ভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদতে অংশীদার সংযুক্ত করার প্রতি ইঙ্গিত করে। অথবা এইরূপ বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করে যে শক্তির উৎস, ক্ষতি এবং দান বা আশীর্বাদ আল্লাহ্‌ ছাড়াও অন্যান্যদের কাছ থেকে আসে।

**প্রকার সমূহ:** শির্ক ৩ প্রকারের, যথাঃ

**১. আশ-শির্ক আল- আকবার** অর্থাৎ বড় শির্ক

**২. আশ-শির্ক আল- আসগার** অর্থাৎ ছোট শির্ক

**৩. আশ-শির্ক আল- খফী** অর্থাৎ গোপন শির্ক

**সুস্পষ্ট প্রকাশঃ ১) আশ-শির্ক আল- আকবার (বড় শির্ক):** বড় এবং গুরুতর বহু-ঈশ্বরবাদের উপাদান যার ৪টি রূপঃ

**ক) শির্ক- আদ-দু’আ:** অর্থাৎ ঐকান্তিক ভাবে যাচনা বা প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে শির্ক করা। ইহা আল্লাহ্‌ ছাড়া ও অন্যান্য দেবদেবীর নিকট অনুনয়, যাচনা বা প্রার্থনা করার প্রতি ইঙ্গিত করে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, “উহারা যখন নৌযানে আরোহন করে তখন উহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়াইয়া উহাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তাহারা শির্কে লিপ্ত হয়।” (সূরা আনকাবুত, আয়াত নং ৬৫)

**খ) শির্ক-আল- নিয়্যাহ ওয়াল-ইরাদাহ্‌ ওয়াল- ক্কাস্‌দ:** ইহা উপাসনা বা ইবাদাতে ও ধর্মীয় আমলের নিয়াত, উদ্দেশ্য ও সংকল্পের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যান্য দেবদেবীর দিকে তা করার ইঙ্গিত করে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মূর্তি, দেব-দেবী ইত্যাদির জন্য ইবাদত বা উপাসনা করার নিয়ত করা)।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, “যে কেহ পার্থিব জীবন ও উহার শোভা কামনা করে, দুনিয়ায় আমি উহাদের কর্মের পূর্নফল দান করি এবং সেখানে তাহাদেরকে কম দেওয়া হইবে না। উহাদের জন্য আখিরাতে দোজখ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই এবং উহারা যাহা করে আখিরাতে তাহা নিষ্ফল হইবে এবং উহারা যাহা করিয়া থাকে তাহা নিরর্থক।” (সূরা হূদ , আয়াত নং ১৫-১৬)

**গ) শির্ক আত- তা’আহ:** শির্কের এই রূপ আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে যে কোন কর্তৃপক্ষের (ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক) আনুগত্য করার প্রতি ইঙ্গিত করে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, “তাহারা আল্লাহ্‌ ব্যতিত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার- বিরাগীগণকে তাহাদের প্রভু রূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং মারইয়াম-তনয় মসীহ্‌-কেও। কিন্তু উহারা এক ইলাহের ইবাদত করিবার জন্যই আদিষ্ট হইয়াছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্‌ নাই। তাহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি কত পবিত্র।” (সূরা তাওবা , আয়াত নং ৩১)

একদা যখন আল্লাহর রসূল উক্ত আয়াত আবৃত্তি করেছিলেন, আদী বিন হাতিম বলিলেন, হে আল্লাহর রসূল, তাহারা তাহাদের (ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্ম যাজক ও সন্নাসীদের) পূজা/উপাসনা করে না।” আল্লাহর রসূল বলিলেন, “তাহারা নিশ্চিতভাবেই তা করে। তাহারা (যাজক ও সন্ন্যাসীরা) অবৈধ জিনিসকে বৈধ করে এবং বৈধ জিনিসকে অবৈধ করে এবং তাহারা (ইহুদী ও খ্রিস্টানরা) তাহাদের অনুসরন করে; এবং এটা করার দ্বারা তাহারা প্রকৃত পক্ষে তাহাদের ইবাদত/উপাসনা করে। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, এবং ইবনে জারীর (তাফসীর আত - তাবারী, ভলিউম-১০, পৃষ্ঠা-১১৪)

**ঘ) শির্ক আল-মাহাব্বাহ:** এটা একমাত্র আল্লাহ্‌ যেরূপ ভালোবাসা পাবার অধিকারী তাহা অন্য কাহাকেও দেখানোর প্রতি ইঙ্গিত করে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, “তথাপি মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্‌ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষ রূপে গ্রহন করে এবং আল্লাহ্‌ কে ভালোবাসার অনুরুপ তাহাদেরকে ভালোবাসে; কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসায় তাহারা সুদৃঢ়। যালিমরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিলে যেমন বুঝিবে, হায়! এখন যদি তাহারা তেমন বুঝিত, সমস্ত শক্তি আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্‌ শাস্তি দানে কঠোর।” (বাকারাহ্‌ , আয়াত নং ১৬৫)

**২. শির্ক আল- আসগর আর- রিয়া:** (ছোট শির্ক অর্থাৎ লোক দেখানো আমল বা কার্যাদি)

যে কোন ইবাদত অথবা ধর্মীয় আমল যাহা প্রশংসা, যশ-খ্যাতি অথবা জাগতিক লাভের জন্য করা হয় তাহা এই শ্রেণীর মধ্যে শামিল।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ বলেন, “বল, (হে মুহাম্মাদ ﷺ)”আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ (ওহী) হয় যে, তোমাদের উপাস্যই (ইলাহ্‌) একমাত্র উপাস্য (ইলাহ্‌)। সুতরাং যে তাহার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তাহার প্রতিপালকের ইবাদতে কাহাকেও শরীক না করে।” (সূরা কাহাফ , আয়াত নং ১১০)

**৩. আস- শির্ক আল খফী (গোপন শির্ক):** এটা আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যের অখণ্ডনীয় অবস্থার প্রতি মনের অসন্তষ্টি; সচেতনভাবে এই বলে আফসোস করতে থাকা যে, তুমি যদি এভাবে না করে অন্যভাবে করতে বা ঐভাবে চেষ্টা না করে এভাবে এভাবে করতে তাহলে অবস্থাটা আরো ভালো হতো।

মহানবী (ﷺ) বলেছেন, “মুসলিম জাতির মধ্যে গোপন শির্ক হলো রাত্রির অন্ধকারে কালো পাথরের উপর দিয়ে চলমান কালো পিঁপড়ার চাইতেও অধিক গোপন। আর এই গোপন শির্কের প্রতিকার হবে প্রতিদিন নিম্নোক্ত বাক্যে প্রার্থনা বা দু’আর দ্বারা, “হে আল্লাহ্‌! আমি সজ্ঞানে কোন শির্ক করা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি আর অজ্ঞাতসারে কৃত গুনাহের জন্য আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি।” (আহমাদ, বায়হাকী) (আদাবুল মুফরাদ, মুসনাদে আহমাদ)

অনুবাদকের সংযোজন[[3]](#footnote-3)

আল-কুফর (অবিশ্বাস, অস্বীকার, অমান্যতা, অকৃতজ্ঞতা)

আল-কুফর (অবিশ্বাস, অস্বীকার, অমান্যতা, অকৃতজ্ঞতা) ও ইহার প্রকাশিত নানা রূপ:

**কুফর মূলত ইসলামী বিশ্বাসের যে কোন রুকনের (খুটি বা স্তম্ভ) প্রতি অবিশ্বাস, অস্বীকার, অমান্যতা এবং অকৃতজ্ঞতা। ইসলামী বিশ্বাসের রুকন সমূহ হলো বিশ্বাস করা-**

১। আল্লাহর উপর

২। তাঁহার ফেরেশতাগণের উপর

৩। তাঁহার রসূল অর্থাৎ বার্তা বা বাণী বাহকদের উপর

৪। তাঁহার অবর্তীন কিতাবসমূহে

৫। পুণরুত্থান দিবসের উপর এবং

৬। ভাগ্য লিপিতে তথা স্বর্গীয় পূর্বনির্ধারিত বিধানের উপর (যথা আল্লাহ আজ্জা ওয়া যাল যা নির্ধারণ করেছেন তা অবশ্যই সংঘটিত হবে)

**আল-কুফর (অবিশ্বাস, অস্বীকার, অকৃতজ্ঞতা, অমান্যতা) এর দুইটি রূপ:**

**১। বড় কুফর বা কুফর আল- আকবার:**

কুফরের এই রূপ যেকোন ব্যক্তিকে ইসলামী সমাজ থেকে পুরোপুরি বের করে দেয়। এই বড় ধরনের কুফর ৫ প্রকারের।

**ক) কুফর আল তাকযীব:** ইহা ইঙ্গিত করে স্বর্গীয় সত্যকে (ওহীকে) অবিশ্বাস/অস্বীকার/অমান্য করা বা ঈমানের যে কোন রুকনকে অবিশ্বাস, অমান্য, অস্বীকার করা। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন,

“যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে এবং সত্য আসিবার পর উহা অস্বীকার করে তাহার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? কাফিরদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?” (সূরা যুমার, আয়াত নং ৩২)

**খ) কুফর আল ইবা ওয়াত তাকাববুর মা- আত তাসদিক (অহংকারের কুফর):**

এটা ইঙ্গিত করে আল্লাহর বিধানকে (আদেশ, নিষেধ) সত্য জানার পরেও তা মানার ব্যাপারে অহংকার/ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা ও অমান্য করা।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন,

“যখন আমি ফিরিশতাদের বলিলাম, ‘আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতিত সকলেই সিজদা করিল; সে অমান্য করিল ও অহংকার করিল। সুতরাং সে কাফিরদের অর্ন্তভ’ক্ত হইল।” (সূরা বাকারা- ৩৪

**গ) কুফর আস-সাক্ক ও ওয়াজ জান্ন:** ইহা ঈমানের (বিশ্বাসের) ৬টি স্তম্ভের ব্যাপারে সন্দেহ বা বিশ্বাসের অভাবের দিকে ইঙ্গিত করে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, “এই ভাবে নিজের প্রতি জুলুম করে সে তাহার উদ্যানে প্রবেশ করিল। সে বলিল, ”আমি মনে করি না যে, কিয়ামত কখনও সংঘটিত হইবে; আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই তবে আমি তো নিশ্চয় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাইব। ’’ তদুত্তরে তাহার সঙ্গী তাহাকে বলিল, ”তুমি কি তাহাকে অস্বীকার করিতেছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন মনুষ্য-আকৃতিতে? কিন্তু তিনিই আল্লাহ, আমার প্রতিপালক এবং আমি কাহাকেও আমার প্রতিপালকের শরীক করি না।” (সূরা কাহাফ , আয়াত নং ৩৫-৩৮)

**ঘ) কুফর আল-ইরাদ (অবজ্ঞার কুফর):** এটা ইঙ্গিত করে জেনে বুঝে সত্য থেকে মুখে ফিরিয়ে নেয়া বা আল্লাহর অবর্তীন স্পষ্ট নিদর্শন থেকে পথভ্রষ্ট হওয়া।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, “আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু কাফিররা, উহাদিগকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয়।” (সূরা আহকাফ , আয়াত নং ৩)

**ঙ) কুফর আল-নিফাক:** এটা মোনাফেকি বা ভন্ডামী পূর্ণ ঈমান (বিশ্বাস) তথা অবিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, “উহারা উহাদের শপথগুলিকে ঢালরূপে ব্যবহার করে আর উহারা আল্লাহর পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। উহারা যাহা করিতেছে তাহা কত মন্দ। ইহা এই জন্য যে, উহারা ঈমান আনিবার পর কুফরী করিয়াছে। ফলে উহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেওয়া হইয়াছে পরিণামে উহারা বুঝে না।” (সূরা আল মুনাফিকুন , আয়াত নং ২-৩)

**২। ছোট কুফর (কুফর আল আসগর): অকৃতজ্ঞতা (অবিশ্বাস, অস্বীকার, অমান্যতা)**

অবিশ্বাসের এই রূপ কাউকে ইসলামী সমাজ থেকে বের করে দেয় না। এটাকে নিয়ামতের কুফরীও বলা হয়। এটা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহের প্রতি অবিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করে যা অকৃতজ্ঞতা বা না-শোকরীর মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিতেছেন এক জনপদের যাহা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে আসিত সর্বদিক হইতে উহার প্রচুর জীবনোপকরণ; অত:পর উহা (উহার অধিবাসীরা) আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করিল, ফলে তাহারা যাহা করিত তজ্জন্য আল্লাহ তাহাদেরকে স্বাদ গ্রহণ করাইলেন ক্ষুধা (দুর্ভিক্ষ) ও ভীতির আচ্ছাদনের।” (সূরা নাহল , আয়াত নং ১১২)

অনুবাদকের সংযোজন[[4]](#footnote-4)

আন-নিফাক (কপটতা বা মুনাফিকী)

**কপটতা (মুনাফিকী)** ও ইহার বিচিত্র স্পষ্ট প্রকাশিত রূপ।

কপটতা দুই ধরণের যথাঃ

ক) বিশ্বাসের কপটতা খ) কর্মগত বা আমলে কপটতা

**ক) বিশ্বাসে কপটতা:**

বিশ্বাসে কপটতার ৬টি রূপ:

১. আল্লাহর রসূল (বার্তাবাহক/বাণীবাহক/দূত) মুহাম্মদ (ﷺ) কে মিথ্যা জানা /মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

২. রসূল মুহাম্মদ (ﷺ) যা কিছু এনেছেন তার কিছু বিষয়কে মিথ্যা জানা বা প্রতিপন্ন করা। (যেমন: কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামের আইন ও নীতি আদর্শ)

(অনুবাদক: উপরোক্ত ২টি বিষয়কে একত্রে এভাবে বলা যায়: ১) রসূল মুহাম্মদ (ﷺ) ও ২) তাঁর আনীত কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামের আইন বিধান ও নীতি আদর্শকে মিথ্যা জানা বা প্রতিপন্ন করা)

৩. রসূল (আল্লাহর সংবাদ বাহক/বাণীবাহক/দূত) মুহাম্মদ (ﷺ) কে ঘৃণা ও অপছন্দ করা।

৪. রসূল মুহাম্মদ (ﷺ) যা এনেছেন (অর্থাৎ ইসলামের একত্ববাদ ও আইন বিধান ইত্যাদি) তার কিছু বিষয়কে ঘৃণা ও অপছন্দ করা।

(অনুবাদক: উপরোক্ত ৩ ও ৪ নং ক্রমিকে বর্ণিত বিষয়কে একত্রে এভাবে বলা যায়; ৩) রসূল মুহাম্মদ (ﷺ) কে ও ৪) তাঁর আনীত ইসলামী একত্ববাদের কিছু বিষয়কে ঘৃনা ও অপছন্দ করা)

৫. আল্লাহর রসূলের (ﷺ) ধর্মের সম্মানহানি বা অবমাননায় সুখানুভব করা।

৬. আল্লাহর রসূলের (ﷺ) ধর্মের বিজয়কে অপছন্দ করা (ইসলামের বিজয়ে আনন্দিত না হওয়া)।

যে ব্যক্তির মধ্যে এই ৬ প্রকারের মুনাফিকী বা কপটতা থাকবে সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থন করবে। (সুরা নিসা, আয়াত নং ১৪৫ দ্রষ্টব্য)

**খ) কর্মে বা আমলের মধ্যে কপটতা:**

কর্ম বা আমলগত কপটতা বা মুনাফিকীর ৫-টি রূপ আছে যার প্রমাণ আল্লাহর রসূলের (ﷺ) বর্ণনা। মুনাফিকের চিহ্ন বা লক্ষণ হলো এগুলো:

১. যখন সে কথা বলে, সে মিথ্যা বলে।

২. যখন সে ওয়াদা বা অঙ্গীকার করে, সে সর্বদা তা ভঙ্গ করে।

৩. যদি তুমি তাকে বিশ্বাস কর, সে নিজেকে অসৎ প্রমাণ করে (যদি তুমি তার কাছে কিছু আমানত রাখ, সে তা ফেরৎ দিবে না)।

৪. এবং নাবী করীম (ﷺ) এর অপর বর্ণনা: যখন সে ঝগড়া করে, সে হঠকারী, দুর্বিনীত, নির্লজ্জ, অবমাননাকর ও খারাপ ব্যবহার করে (গালিগালাজ করে)।

৫. যখন সে কোন চুক্তি করে, সে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

অনুবাদকের সংযোজন[[5]](#footnote-5)

উপসংহার

উপরে আমরা মূল অনুবাদে দেখেছি যে শিরকের মুলোচ্ছেদ করে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই পৃথিবীতে আল্লাহ নবী রাসূলদের পাঠিয়েছেন। অতঃপর ইসলামের কেন্দ্র বা ভিত্তিমূল ৩ প্রকারের তাওহীদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে আল্লাহর তায়ালার সঠিক পরিচয় পেশ করা হয়েছে।

শুধু অন্তরে বিশ্বাস ও মুখে আল্লাহর স্বীকৃতি দিলেই তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন হয় না। যেমনিভাবে মক্কার মুশরিকরা আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকার করতো, এমনকি কথায় কথায় তাদের নেতারা আল্লাহর নামে শপথ করে কথাও বলতো (অর্থাৎ তারা তাওহীদে রবুবিয়াহ বা প্রভূত্বের একত্ববাদে বিশ্বাস করতো যার বর্ণনা কুরআনে রয়েছে [সূরা ইউসুফ ১০৬, আনকাবুত ৬১ ও ৬৩, মুমিনুন ৮৪-৮৯, আয-যুমার ৩])। কিন্তু তারা ইবাদাৎ ও গুণাবলীর একত্ববাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর সৃষ্টিকে সমকক্ষ বা শরীক মনে করতো। এমনকি রেসালাত ও অন্যান্য দ্বীনী বিষয় অস্বীকার করতো। সেকারনে তারা প্রকৃত ঈমানদার হতে পারেনি। বরং তারা মুশরিক ছিলো, যাদের বিরুদ্ধে রাসূল (ﷺ) বহু সংখ্যক জিহাদে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

এরপরে তাওহীদ ও রেসালাতের মৌল বাণী লা’ ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে বান্দার ৪ দফা অঙ্গীকারনামায় আবদ্ধ হয়ে মুসলিম হিসেবে ইসলামে প্রবেশ করার বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তষ্টি উদ্রেককারী কথা ও কর্ম থেকে বিরত থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাহ মাফিক সৎকাজ সম্পাদন করাকে সফলতা বা জান্নাত লাভের উপায় বলা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে একজন মুসলিম ব্যক্তি পুনরায় যেসব কথা ও কর্মের মাধ্যমে শির্ক, কুফরি, মুনাফিকীতে (যা ৫ প্রকার বড় কুফরীর ১ টি) লিপ্ত হয়ে তার ঈমান ও আমল বিনষ্ট করে ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত হয়ে যায় এবং মহাশাস্তির যোগ্য হয় তার আলোচনা করা হয়েছে। তাই শির্ক, কুফরি ও নিফাকের জ্ঞানার্জন সচেতনভাবে তাওহীদের জ্ঞানসহ ঈমান আনার মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষ গুরুত্বের কারনে মুনাফিকদের চরিত্র ও বৈশিষ্ঠের কথা মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবের বহুসংখ্যক আয়াতে এবং নাবী (ﷺ) বহু হাদীসে বর্ননা দিয়ে তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন যাতে মুমিনরা তাদের সমূহ ক্ষতি থেকে আত্নরক্ষা করতে পারে। উল্লেখ্য, মুনাফিকরা মুসলিম সমাজের মাঝেই বাস করে এবং তাদের সৃষ্ট ফিতনার কারনে মুমিন মুসলমানরা দুঃখ, কষ্ট ও বহু ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

তাই মূল অনুবাদের সঙ্গে মুনাফিকের স্বভাব-আচরণ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস থেকে উপরোক্ত সংযোজন বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভে অধিকতর সহায়ক হবে ইনশাল্লাহ। এতে করে সিনেমার ভিলেন তথা খলনায়কের মত মুনাফিকরা কিভাবে আমানতের খেয়ানত, ওয়াদা বা চুক্তি ভঙ্গ, মিথ্যা বলা, প্রতারণা (সুপরিকল্পিতভাবে ব্যক্তিগত লাভের জন্য যা সঠিক নয় এমন কিছুকে সত্য বা সঠিক বলে বিশ্বাস করানো -কেমব্রিজ ডিকশনারি), আত্নীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা, আত্মসাৎ ও বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদির মাধ্যমে মানব সমাজে বিশেষ করে মুসলিম সমাজে সমূহ কলহ-বিবাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করে তা জানা যাবে। এতদসঙ্গে সমাজের **ক্যান্সারতুল্য** মুনাফিক (যারা মানবসমাজের নিকৃষ্টতম জীব এবং শাস্তি হিসেবে জাহান্নামের সর্বন্মিম্ন স্তরে অবস্থান করবে) ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে ব্যক্তি সে আলোকে আত্মসমালোচনা করে নিজেকে সংশোধন করতে এবং কবর ও জাহান্নামের ভয়াবহ স্থায়ী শাস্তি হতে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। অধিকন্তু, ইসলামের আলো বঞ্চিত সমাজের মুনাফিক বা মুনাফিক স্বভাবের মানব সন্তানদেরকে (যারা আপনার বা আমাদেরই কোনো স্বজন-পরিজন) মুক্তির পথ প্রদর্শন করতে পারেন। যা হবে শ্রেষ্ঠ জনসেবা ও সমাজ সংস্কারের কাজ- সদকায়ে জারিয়ার আমল। গুরুত্ব বিবেচনায় এর চাইতে বড় জনকল্যান কিই বা হতে পারে।

সুতরাং প্রতিটি পরিবারে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরে, ওয়াজ-মাহফিল ও জুমা’র খুতবায় এই বিষয়ের ব্যাপক আলোচনা, প্রচার ও শিক্ষা দান মানব সমাজে কলহ বিবাদ, সংঘর্ষ-হানাহানি, হত্যাকান্ড সংঘটন বা সেরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি ও লক্ষ লক্ষ মামলা মোকাদ্দমা দূর করতে এবং বহু কাঙ্খিত শান্তি প্রতিষ্ঠায় একান্ত সহায়ক হবে ইনশা’আল্লাহ্। প্রত্যেক পরিবার থেকেই এ কাজ শুরু হওয়া উচিৎ এবং **সপ্তাহে কমপক্ষে ১/২ দিন** পরিবারের সবাইকে নিয়ে এই বই থেকে অথবা এ জাতীয় অন্য কোন বই থেকে বিষয়ভিত্তিক পাঠ করা বা সারকথা উপস্থাপন করে আলোচনা করলে তা **নিজেরা সহ সন্তানদের জন্য বাঞ্ছিত সুফল লাভে সহায়ক হবে।**

এই কাজে সাধ্যমত সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য সম্মানিত পাঠক (বিশেষ করে সম্মানিত ঈমাম, মুয়াল্লিম, মুবাল্লিগ) ভাই-বোনদের প্রতি ঐকান্তিক অনুরোধ রইলো। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, দ্বীনী শিক্ষায় পিএইডি ডিগ্রিধারী ও ১৮টি গ্রন্থ প্রনেতা ড. মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মাদানী তার লিখিত ‘আল্লাহ এক’ বইয়ের ভূমিকায় আফসোসের সাথে উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ইলমুল আকাইদ, ইলমুল কালাম ইত্যাদি বিষয় থাকার পরেও তাহওহীদের সঠিক ধারনা পাওয়ার সুযোগ কম। এমতাবস্থায় তিনি ১৯৯১ সালে (ঢাকা তা’মীরুল মিল্লাত মাদ্রাসা থেকে প্রথম শ্রেণীতে কামিল পাসের পর) মদিনা মুনাওয়ারাহ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবার আগ পর্যন্ত তিনি এ সম্পর্কে অনেকটা অন্ধকারে ছিলেন। আশাকরি এ থেকে পাঠক ভাইবোনেরা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী আকীদাহ বিভাগের অধ্যাপকের লেখা থেকে অত্র অনুবাদ ও তার সংযোজন বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন। জীবন সায়াহ্নে উক্ত বিষয়ের একজন পাঠক ও অনুবাদক হতে পেরে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। এতদসঙ্গে আমার হৃদয়ের ঐকান্তিক আকাঙ্খা ছোট এই পুস্তকাটি আমাদের সন্তান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের কল্যানে সবরকম শিক্ষার প্রাথমিক থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জাতীয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভক্ত করা হবে।

**ইসলামের প্রাথমিক যুগে কোন মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলো না, অথচ অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের শিক্ষা প্রদান ও প্রচার করা হত এবং নিজেদের শিক্ষার পাশাপাশি আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানকারীর দায়িত্বও মুসলমানরা পালন করতো।** আর আমাদের নিকট উভয় পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের সুযোগ উন্মুক্ত রয়েছে।

এই বইয়ে আলোচিত জ্ঞান ও বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে আপনার পরিবারেই আপনার কষ্টার্জিত অর্থে প্রতিপালিত হয়তোবা তৎসঙ্গে বহু জাগতিক বিষয়ে ডিগ্রী ও পদপদবীধারী স্নেহের সন্তান, স্ত্রী বা মিথ্যাচারী কোন ভাইবোন, পরিজন, প্রতিবেশী, সহকর্মী এবং সহযোদ্ধা দ্বারাই আপনি নানানভাবে প্রতারিত হয়ে দুনিয়া এমনকি আখেরাতে ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। তখন তাদের অকৃতজ্ঞতা ও মুনাফিকী স্বভাব আচরণ আপনার জন্য বড় দুঃখ ও মনোকষ্টের কারণ হবে এটাই স্বাভাবিক। ফলশ্রুতিতে মজলুম হিসাবে আপনার অসন্তুষ্টি, কখনওবা আপনার বদ দু’আর মাধ্যমে ঐসব ব্যক্তিরাও বড় রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ইহ-পরলোকে। সেক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ স্বজন বিশেষ করে সন্তানের খারাপ পরিণতি এরূপ ব্যক্তির জীবনেও তখন বড় দুঃখ-হতাশার কারণ হবে। কিন্তু আপনার আমার মতো আমাদের স্নেহের সন্তানেরাও তো অতীব প্রয়োজনীয় উক্ত অমূল্য শিক্ষা বিশেষ করে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার কোন স্তরেই তা ভালোভাবে লাভের সূযোগ পাচ্ছেনা। তাই কিভাবে আমরা এবিষয়ে শিক্ষা না দিয়ে তাদেরকে দোষারোপ করবো, বদ’দোয়া করে নিজ হাতে নিজ সন্তানকে ধ্বংস করবো! জাতির নেতৃবৃন্দ এবং সন্তানের অভিভাবক হিসাবে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে এর কি জবাব দিব! উক্ত বাস্তবতার আলোকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অন্যান্য বিষয়ের সাথে উক্ত বিষয়ের শিক্ষা ও প্রাত্যহিক জীবনে তার ব্যাপক চর্চা/অনুশীলন করতে আমাদের প্রত্যেকের সক্রিয় ভূমিকা পালন করা কর্তব্য। নইলে মণকে মণ বই-কেতাব পড়ে, বহু সার্টিফিকেট অর্জন করে উচ্চপদমর্যাদা ও ক্ষমতায় আসীন হয়েও কোন ব্যক্তি **পাক্কা মুনাফিক** হতে পারে। **জামার আস্তিনে লুকানো বিষধর সর্পের মত** সে আপনার, আমার ও পরিবার-সমাজের মানুষের জন্য মারাত্নক ক্ষতিকর হতে পারে।

আল্লাহ্‌ কর্তৃক ‘কাকের’ দাফন দৃশ্য দেখানোর আগে পর্যন্ত কাবিল তারই হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত আপন ভাই হাবিলকে কবরস্থ করার দিশা/হুঁশ পায়নি। যে কারণে সে নিজেকে ধীক্কার দিয়েছে। তদ্রুপ আমাদের সন্তানদের পথ প্রদর্শণ না করলে তারা কিভাবে হেদায়াত লাভ করবে? জ্ঞান লাভের পরেও যারা তা অমান্য করে আল্লাহ্‌র ক্রোধভাজন (মাগদুবে আলাইহিম) হবে, তাদের কথা আলাদা। নবীদের ঘরেও কাফের সন্তান ও স্ত্রীর দৃষ্টান্ত কুরআনের বর্ণনায় এসেছে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ ক্বিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম আদাম (আঃ)-কে ডাকা হবে। তিনি তাঁর সন্তানদের দেখতে পাবেন। তখন তাদেরকে বলা হবে, ইনি তোমাদের পিতা আদাম (আঃ)। তখন তারা বলবে (আরবী) আমরা তোমার খিদমাতে হাযির! এরপর তাঁকে আল্লাহ্ বলবেন, তোমার জাহান্নামী বংশধরকে বের কর। তখন আদাম (আঃ) বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! কী পরিমাণ বের করব? আল্লাহ্ বলবেনঃ প্রতি একশ’ তে নিরানব্বই জনকে বের কর। তখন সহাবাগণ বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (ﷺ)! প্রতি একশ’ থেকে নিরানব্বই জনকে বের করা হবে তখন আর আমাদের কে বাকী থাকবে? তিনি (ﷺ) বললেনঃ নিশ্চয়ই অন্যান্য সকল উম্মাতের তুলনায় আমার উম্মাত হল কাল ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা চুলের মত। (বুখারী ৬৫২৯, আধুনিক প্রকাশনী- ৬০৭৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬০৮৫)

যদিও পরবর্তীতে শাফায়াত বা সুপারিশের মাধ্যমে অগণিত মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে। তবুও এটা মানব জাতির এমনকি উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যও একটি ভয়াবহ দুঃসংবাদ বা উদ্বেগের কারণ। অবশ্য অন্যান্য নবীর উম্মতের তুলনায় তাদের সংখ্যা কালো ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা চুলের মতো বলে নবীজী (ﷺ) আশ্বস্ত করেছেন।

যেকোন সফলতার পিছনে থাকে দীর্ঘ প্রস্তুতি। যে ছাত্র ভালো প্রস্তুতি গ্রহণ করে, সে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বাঞ্ছিত সুফলই পেয়ে থাকে। কিন্তু যার প্রস্তুতিই থাকে না এবং ভালো কিছু লাভের ব্যাপারে উদাসীন, সে পরীক্ষায় পাশ করার এমনকি গ্রেস মার্ক নিয়েও পাশের আশা করে না। এটাই বাস্তবতা।

**“মানুষ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যা কিছু করে সেটাই তাঁর জন্য সৌভাগ্য বা দূর্ভাগ্য বয়ে আনে।”** (বুখারী)

জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেবলমাত্র কেয়ামতের দিনই তোমাদেরকে তোমাদেরকে কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। অতঃপর যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছু নয়। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ১৮৫)

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত প্রকৃত সফলকাম ব্যক্তিদের দলে শামিল হতে জ্ঞান অন্বেষনকারী ভাই ও বোনদের প্রতি আমি আহবান জানাই এবং এই প্রত্যাশা করি তারা যেন তাদের সন্তান, ভাই, বোন ও স্বজনদের প্রতি সদয় হন এবং অনুগ্রহ করে এই পুস্তিকায় বর্ণিত সংক্ষিপ্ত জ্ঞানের বিষয়বস্তু তাদের অবহিত করার ত্যাগ স্বীকার করেন। এটা সর্বোত্তম কল্যাণকর জনসেবা, সমাজ সংস্কারের কাজ ও **সদকায়ে জারিয়ার** যা ব্যক্তির **শুভ পরিণাম** লাভে অতীব সহায়ক আমল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে, ইনশা’আল্লাহ্‌।

‏”‏ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ‏“

গ্রন্থপঞ্জি

এ গ্রন্থ অনুবাদ ও সংযোজনের কাজে যে সকল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে এবং তৎসঙ্গে যে সকল গ্রন্থ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু বিস্তারিত জানতে সহায়ক সে সব গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে পাঠক ও গবেষকদের সুবিধার্থে প্রদান করা হলো:

১. দি নোব্‌ল কুরআন, ড. মুহাম্মাদ তাকীউদ্দিন আল-হিলালী ও ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন খান।

২. আল-কুরআনুল করীম, বাংলা তরজমা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

৩. তাফসীরে আবু বকর যাকারিয়া, লেখক : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

৪. তাফসীরে আহসানুল বায়ান, লেখক: শাইখ সালাহুদ্দিন ইউসুফ

৫. তাফসীরে ইবনে কাছীর, লেখক: আল্লামা হাফীজ ইবনে কাসীর

৬. তাফসীরে ফাতহুল মাজীদ, লেখক: [শাইখ শহীদুল্লাহ খান মাদানী](https://ikhlasstore.com/product-category/writers/%e0%a6%b6%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%96-%e0%a6%b6%e0%a6%b9%e0%a7%80%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b9-%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%be/)

৭. কুরআন সুন্নাহ্‌র আলোকে ইসলামী আক্বিদা, ডঃ খন্দকার আবদুল্লাহ্‌ জাহাঙ্গীর

৮. রাহে বেলায়াত, ডঃ খন্দকার আবদুল্লাহ্‌ জাহাঙ্গীর

৯. সহীহ্‌ আক্বীদার দিশারী, মূল- শাইখ ডঃ ছুলেহ ইবনে ফাওযান আল ফাওয়ান

১০. আল কুরআনের বিষয়ভিত্তিক অভিধান, আসাদ বিন হাফিজ

১১. আল কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম, ২য় খন্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

১২. মা’রিফুল হাদীস (১ম খন্ড), মাওলানা মনযুর নোমানী (রহঃ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

১৩. পথের সম্বল (হাদীস সংকলন), মাওলানা জলীল আহসান নদভী, বাংলা ইসলামী প্রকাশনা ট্রাষ্ট, কলিকাতা, ভারত।

১৪. যে সব কারণে ঈমান ক্ষতিগ্রস্থ হয়, শাইখ আবদুর রহমান বিন মুবারক আলী, ইমাম পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।

১৫. কুরআন, মহাবিশ্ব ও মহাধবংস, মুহাম্মদ আনওয়ার হুসাইন, প্রকাশকঃ রিসার্স একাডেমী ফর কুরআন এন্ড সায়েন্স, ২৩০, এ্যালিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

১৬. সৃষ্টি-মহাপ্রলয় তত্ত্বে ব্লাকহোল ও কোরান হাদীস, প্রকৌশলী মোঃ মাহবুবুল আলম, সার্ভিস পাবলিশার্স, কবি নজরুল ইসলাম সড়ক, বগুড়া

১৭. তাওহীদের মর্মকথা - আল্লাহ এক, ড. খলিলুর রহমান মাদানী।

এক নযরে আক্বীদা ও তাওহীদ, ড. মুযাফফর বিন মুহসিন।

১৮. এক নযরে আক্বীদা ও তাওহীদ, ড. মুযাফফর বিন মুহসিন।

১৯. কিতাবুত তাওহীদ, মুহাম্মাদ আব্দুল ওহাব, পিস পাবলিকেশন্স

২০. ভালো মৃত্যুর উপায়, এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী।

২১. আল কুরআনে বিজ্ঞান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

\_০\_

1. **অনুবাদকের সংযোজন: (ক) তাওহীদ-উর-রবুবিয়্যাহ**

   ১। তিন প্রকার তাওহীদের কেন্দ্র বিন্দু জগতসমূহের রব মহিমান্বিত আল্লাহর পরিচয় সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা ও নোটসহ) উপস্থাপিত হলো যা স্বচ্ছ ধারণা লাভে সহায়ক:

   ➧ “আর আলোকিত হলো যমীন তার প্রভূর আলোতে।” (সূরা আয-যুমার, আয়াত নং ৬৯)

   ➧ “আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের জ্যোতি আল্লাহ্‌ আসমানসমূহ ও যমীনের নূর (জোত্যি বা আলো)।” (সূরা নূর, আয়াত নং ৩৫)

   ব্যাখ্যা: নূরের সংজ্ঞাঃ নূর শব্দের আভিধানিক অর্থ আলো। [ফাতহুল কাদীর] কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর জন্য নূর কয়েকভাবে সাব্যস্ত হয়েছে।

   এক) আল্লাহর নাম হিসাবে। যে সমস্ত আলেমগণ এটাকে আল্লাহর নাম হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন তারা হলেন, বাইহাকী, কুরতুবী, ইবনু তাইমিয়াহ, ইবনুল কাইয়্যেম, ইবনে হাজার, আস-সা‘দী প্রমুখ।

   দুই) আল্লাহর গুণ হিসাবে। যেমন-

   আল্লাহ্‌ বলেন, “আর আলোকিত হলো যমীন তার প্রভূর আলোতে।” [সূরা আয-যুমারঃ ৬৯]

   আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ ‘আসমান ও যমীনের যাবতীয় নূর তাঁরই চেহারার আলো। [আবু সাইদ আদ-দারেমী]

   তিন) আল্লাহর নূরকে আসমান ও যমীনের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা‘আলা বলেনঃ “আল্লাহ্‌ আসমান ও যমীনের নূর।”

   রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ অর্থাৎ ‘হে আল্লাহ্‌, আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপনি আসমান ও যমীনের আলো এবং এ দু’য়ের মধ্যে যা আছে তারও (আলো)...। [বুখারীঃ ১১২০, মুসলিমঃ ১৯৯]

   চার) আল্লাহর পর্দাও নূর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ‘তাঁর পর্দা হলো নূর।’ [মুসলিমঃ ২৯৩] আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি‘রাজের রাতে এর নূরই দেখেছিলেন। সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ ‘আপনি কি আপনার প্রভূকে দেখেছিলেন? তিনি বললেনঃ নূর! কিভাবে তাকে দেখতে পারি?’ [মুসলিমঃ ২৯১] অপর বর্ণনায় এসেছে, ‘আমি নূর দেখেছি।’ [মুসলিমঃ ২৯২] এ হাদীসের সঠিক অর্থ হলো, আমি কিভাবে তাঁকে দেখতে পাব? সেখানে তো নূর ছিল। যা তাকে দেখার মাঝে বাঁধা দিচ্ছিল। আমি তো কেবল নূর দেখেছি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহর পর্দাও নূর। এ নূরের পর্দার কারণেই সবকিছু পুড়ে যাচ্ছে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ‘যদি তিনি তাঁর পর্দা খুলতেন তবে তাঁর সৃষ্টির যতটুকুতে তাঁর নজর পড়ত সবকিছু তাঁর চেহারার আলোর কারণে পুড়ে যেত।’ [মুসলিমঃ ২৯৩-২৯৫]

   সুতরাং আসমান ও যমীনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দু‘ধরনের নূরই আল্লাহর। প্রকাশ্য নূর যেমন- আল্লাহ্‌ তা‘আলা স্বয়ং নূর। তাঁর পর্দা নূরের। যদি তিনি তাঁর সে পর্দা উন্মোচন করেন, তাহলে তাঁর সৃষ্টির যতটুকুতে তাঁর দৃষ্টি পড়বে তার সবকিছুই ভস্ম হয়ে যাবে। তাঁর নূরেই আরশ আলোকিত। তাঁর নূরেই কুরসী, সূর্য, চাদ ইত্যাদি আলোকিত। অনুরূপভাবে তাঁর নূরেই জান্নাত আলোকিত। কারণ, সেখানে তো আর সূর্য নেই।

   আর অপ্রকাশ্য নূর যেমন- আল্লাহর কিতাব নূর [সূরা আল-আ‘রাফঃ ১৫৭], তাঁর শরীয়ত নূর [সূরা আল-মায়েদাঃ ৪৪], তাঁর বান্দা ও রাসূলদের অন্তরে অবস্থিত ঈমান ও জ্ঞান তাঁরই নূর [সূরা আয-যুমারঃ ২২]। যদি এ নূর না থাকত তাহলে অন্ধকারের উপর অন্ধকারে সবকিছু ছেয়ে যেত। সুতরাং যেখানেই তাঁর নূরের অভাব হবে সেখানেই অন্ধকার ও বিভ্রান্তি দানা বেঁধে থাকে। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো‘আ করতেনঃ ‘হে আল্লাহ্‌, আমার অন্তরে নূর দিন, আমার শ্রবণেন্দ্রীয়ে নূর দিন, আমার দৃষ্টিশক্তিতে নূর দিন, আমার ডানে নূর দিন, আমার বামে নূর দিন, আমার সামনে নূর দিন, আমার পিছনে নূর দিন, আমার উপরে নূর দিন, আমার নীচে নূর দিন। আর আমার জন্য নূর দিন অথবা বলেছেনঃ আমাকে নূর বানিয়ে দিন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আর আমার জন্য আমার আত্মায় নূর দিন। আমার জন্য বৃহৎ নূরের ব্যবস্থা করে দিন। [বুখারীঃ ৬৩১৬, মুসলিমঃ ৭৬৩]

   অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ‘হে আল্লাহ্‌, আমাকে নূর দিন, আমার জন্য আমার অস্থি ও শিরা-উপশিরায় নূর দিন। আমার মাংসে নুর দিন, আমার রক্তে নূর দিন, আমার চুলে নূর দিন, আমার শরীরে নূর দিন।’ অপর বর্ণনায় এসেছে, ‘হে আল্লাহ্‌, আমার জন্য আমার কবরে নূর দিন। আমার হাড্ডিতে নূর দিন।’ [তিরমিযী ৩৪১৯]

   আয়াতে আল্লাহ্‌ তা‘আলার সত্তার জন্য ব্যবহৃত ‘নূর’ শব্দটির অর্থ কোন কোন তাফসীরবিদের মতে ‘মুনাওয়ের' অর্থাৎ ঔজ্জ্বল্যদানকারী। তখন আয়াতের অর্থ হয় যে, আল্লাহ্‌ তা‘আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে বসবাসকারী সব সৃষ্টজীবের নূরদাতা। এই নূর বলে হেদায়াতের নূর বুঝানো হয়েছে। [-বাগভী] (তাফসীরে আবু বকর যাকারিয়া, সংক্ষেপিত)

   নূরের সংজ্ঞা: যে বস্তু নিজে নিজে প্রকাশমান ও উজ্জ্বল এবং অপরাপর বস্তুকেও প্রকাশমান ও উজ্জ্বল করে। (ঈমাম গাযযালী, তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন)

   ➧ “যারা কুফরী করে তারা কি দেখে না যে, আসমানসমূহ ও যমীন মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে, তারপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম; এবং প্রাণবান সব কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে; তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?” (সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং ৩০)

   নোট: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীদের ধারনা হয়েছে যে ১ হাজার ৯ শত কোটি বছর আগে পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিলো না। ছিল না চাঁদ সূর্য, গ্রহ-তারা, ছায়াপথ অর্থাৎ কোন পৃথিবী ও আকাশমন্ডলী। সৃষ্টির সূচনালগ্নে বিপুল উত্তপ্ত ও অপরিসীম ঘনত্ব বিশিষ্ঠ ক্রমঅদৃশ্যমান ক্ষুদ্রাকৃতির এক ফায়ারবল বা অগ্নিগোলক ছিল। এমনি শুন্য সময়ে, ঐ অগ্নিগোলকের বিগ ব্যাং বা মহাবিষ্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্মের সূচনা হয় এবং সেইসাথে সম্পসারণ ঘটে ঐ অগ্নিগোলকের। পরবর্তীতে তাপমাত্রা কমে গিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রথমে কুয়াশার, অতঃপর ছায়াপথ, নক্ষত্রসমূহ এবং গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি সৃষ্টি হয় যার সবই প্রথমে ফায়ারবল বা অগ্নিগোলক আকারে সংযুক্ত ছিল। সাড়ে ৪ শত কোটি বছর আগে আন্ততারকামন্ডলীয় গ্যাস ও ধুলিকণা দ্বারা সৃষ্টি হয়ে আমাদের পৃথিবী গ্রহের যাত্রা শুরু হয়। সৃষ্টি হয় বিভিন্ন গ্যাসের। একপর্যায়ে পৃথিবীপৃষ্ঠ ঠান্ডা হলে বাষ্পীয় জলকণা ঘনীভূত হয়ে ভারী বর্ষণ শুরু হয়। তাতে সৃষ্টি হয় সাগর, মহাসাগর, নদ-নদী ও হ্রদের। অতঃপর পানি থেকে প্রাণবান সকল কিছু সৃষ্টি হয়। -(সংক্ষেপিত, কোরআনে বিজ্ঞান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

   উপরোক্ত বিজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে সুরা বাকারার ১১৭ নং আয়াত এবং সুরা নূরের ১৩৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যার আলোকে মহান আল্লাহর সত্ত্বা, ক্ষমতা ও সৃষ্টি সম্পর্কে আমরা অধিকতর স্বচ্ছ্ব ধারনা পেতে পারি।

   ➧ “বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।” (সূরা ইখলাস, আয়াত নং ১-৪)

   ➧ “আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।” (সূরা বাকারা, আয়াত নং ২৫৫)

   ➧ “আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী (অর্থ জ্ঞানের নৈকট্য যার দ্বারা অন্তরের কথাগুলোও জানতে পারেন)।” (সূরা ক্বাফ, আয়াত নং ১৬)

   ➧ “তিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি ‘আরশের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়, আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয় [১]। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন--তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা [২]।” (সূরা হাদীদ, আয়াত নং ৪)

   ব্যাখ্যা: [১] অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের প্রত্যেকটি বস্তু সদা সর্বদা এ সত্য প্রকাশ এবং ঘোষণা করে চলেছে যে, এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও পালনকর্তা সব রকম দোষ-ত্রুটি, অপূর্ণতা, দুর্বলতা, ভুল ভ্রান্তি ও অকল্যাণ থেকে পবিত্র। তাঁর ব্যক্তি সত্তা পবিত্র, তাঁর গুণাবলী পবিত্র, তাঁর কাজকর্ম পবিত্র এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টিমূলক বা শরীয়াতের বিধান সম্পর্কিত নির্দেশাবলীও পবিত্র। [কুরতুবী; সা’দী]

   [২] আয়াতে هُوَالعَزِيْزُالحَكِيْمُ বলা হয়েছে। عزيز শব্দের অর্থ পরাক্রমশালী, শক্তিমান ও অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী, যাঁর সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন পৃথিবীর কোন শক্তিই রোধ করতে পারে না, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যাঁর আনুগত্য সবাইকে করতে হয়, যাঁর অমান্যকারী কোনভাবেই তাঁর পাকড়াও থেকে রক্ষা পায় না। আর حكيم শব্দের অর্থ হচ্ছে, তিনি যা-ই করেন, জ্ঞান ও যুক্তি বুদ্ধির সাহায্যে করেন। তাঁর সৃষ্টি, তাঁর ব্যবস্থাপনা, তাঁর শাসন, তার আদেশ নিষেধ, তাঁর নির্দেশনা সব কিছুই জ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর। তাঁর কোন কাজেই অজ্ঞতা, বোকামি ও মূর্খতার লেশমাত্র নেই। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] -(তাফসীরে আবু বকর যাকারিয়া)

   নোট: আল্লাহর সুষ্টি সূর্য পৃথিবী থেকে প্রায় সাড়ে ৯ কোটি মাইল দুরে অবস্থিত। অথচ তার আলো, উত্তাপ ও রশ্মি পৃথিবীতে মানুষসহ সবকিছুকেই সর্বদিক থেকেই পরিবেষ্টন করে বা সঙ্গে থাকে। ৫০০ বা ৫০০০ মাইল দুরে গেলেও আমরা তাঁর ক্ষমতার/আওতার বাইরে যেতে পারি না। এমনকি সূর্যের পলকহীন দৃষ্টিরও বাইরে যেতে পারি না। তাহলে কিভাবে আমরা ঐ সূর্যের সৃষ্টিকর্ত ও নিয়ন্ত্রনকারী আল্লাহর নাগালের বা দৃষ্টির বাইরে যেতে পারি! যদিও সূর্যের আলো, উত্তাপ ও কিরণ সূর্য নয় কিন্তু ওসবকিছু সূর্য থেকে আলাদা কিছু নয়। বিশাল সূর্যের এ বাস্তব উদাহরণ “তোমরা যেখানেই থাকো না কে কেন- তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, আর তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা” এই আয়াতের মর্ম অনুধাবনে সহায়ক। যদিও স্বত্তা ও পরিপূর্ণ গুনাবলীতে কোন সৃষ্টি আল্লাহর সমতুল্য হতে পারে না। উপরোক্ত আয়াতসমূহের আলোকে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। অধিকন্তু সর্বশ্রোতা ও দ্রষ্টা মহিমান্বিত আল্লাহকে সর্বদা স্মরণে রাখা এবং আমাদের জীবনাচরণে তার বহিঃপ্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

   ➧ ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেন, “আদিতে একমাত্র আল্লাহ-ই ছিলেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিলনা।” (বুখারী, হাদীছ নং- ৩১৯১, সংক্ষেপিত)

   ২। দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সবকিছুর স্রষ্টা, প্রতিপালক, ধারণকারী ও পরিচালক হিসেবে আল্লাহর পরিচয় সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা ও নোটসহ) উপস্থাপিত হলো যা স্বচ্ছ ধারণা লাভে সহায়ক:

   ➧ “আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও অনুরূপ, [১] ওগুলোর মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ, [২] যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, অবশ্যই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন [৩] ।” (সূরা তালাক্ব, আয়াত নং ১২)

   ব্যাখ্যা: **[১]** أَيْ: خَلَقَ مِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ সাত আসমানের ন্যায় সাত যমীনও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। যেভাবে উপর্যুপরি সাতটি আসমান রয়েছে, অনুরূপ সাতটি যমীনও রয়েছে। এগুলোর মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধানও আছে এবং প্রত্যেক যমীনে আল্লাহর সৃষ্টি আবাদ রয়েছে। (ক্বুরত্ববী) বহু হাদীস দ্বারা এ কথার সমর্থনও পাওয়া যায়। যেমন, নবী (ﷺ) বলেছেন, ”যে ব্যক্তি যুলুম করে বিঘত পরিমাণ যমীন আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনকে তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।” (মুসলিম, বাণিজ্য অধ্যায়, যুলুম করা হারাম পরিচ্ছেদ) সহীহ বুখারীর শব্দাবলী হল, (خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ)”কিয়ামতের দিন তাকে সপ্ত যমীনের নীচ পর্যন্ত ধসিয়ে দেওয়া হবে। (বুখারী, মাযালিম অধ্যায়, যমীন আত্মসাৎ করার পাপ পরিচ্ছেদ) কেউ কেউ এটাও বলেন যে, প্রত্যেক যমীনে ঐ রকমই পয়গম্বর রয়েছেন, যে রকম পয়গম্বর তোমাদের যমীনে এসেছেন। যেমন, আদমের মত আদম, নূহের মত নূহ। ইবরাহীমের মত ইবরাহীম। ঈসার মত ঈসা (বায়হাকী ও মুসতাদরাক হাকেম সহীহ বলেছেন)। কিন্তু এ বর্ণনা কেউ কেউ যয়ীফ বা দূর্বল বলেছেন। **[২]** যেভাবে, প্রত্যেক আসমানে আল্লাহর বিধান কার্যকরী ও বলবৎ আছে, অনুরূপ প্রত্যেক যমীনে তাঁর নির্দেশ চলে। সপ্ত আকাশের মত সপ্ত পৃথিবীর পরিচালনাও তিনিই করেন। **[৩]** অতএব কোন জিনিস তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়, চাহে তা যেমনই হোক না কেন। -(তাফসীরে আহসানুল বায়ান)

   তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, (১) তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন (২) এবং তাকে (আকাশকে) সপ্তাকাশে (৩) বিন্যস্ত করেন, তিনি সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।” (সূরা বাকারা, আয়াত নং ২৯)

   তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের উদ্ভাবক। আর যখন তিনি কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার জন্য শুধু বলেন, ‘হও’, ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা বাকারা, আয়াত নং ১১৭)

   ➧ “আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ উর্ধে স্থাপন করেছেন খুঁটি ছাড়া, তোমরা তা দেখছ। তারপর তিনি ‘আরশের উপর উঠেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়মাধীন করেছেন; প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন, আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাত সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।” (সূরা রাদ, আয়াত নং ২)

   ➧ “তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষদেরও পালনকর্তা।” (সুরা দুখান, আয়াত নং ৮)

   ➧ “আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন এবং যিনি নৌযানকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তাঁর নির্দেশে সেগুলো সাগরে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে।” (সূরা ইব্রাহীম, আয়াত নং ৩২-৩৩)

   ➧ “আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জোড়া; যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং সৃজন করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহমর্মিতা। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা করে।” (সূরা রুম, আয়াত নং ২১)

   ➧ “আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আসমান ও যমীনের স্থিতি থাকে; তারপর আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে যমীন থেকে উঠার জন্য একবার ডাকবেন তখনই তোমরা বেরিয়ে আসবে।” (সূরা রুম, আয়াত নং ২৫)

   ➧ “আল্লাহ্ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বলতা থেকে, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি; শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।” (সূরা রূম, আয়াত নং ৫৪)

   ➧ “আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখী দু’ ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতই একেকটি শ্রেণী। আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি। অতঃপর সবাই স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সমবেত হবে।” (সূরা আনআম, আয়াত নং ৩৮)

   ➧ “নিশ্চয় আল্লাহই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী; তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। তিনি আল্লাহ অতঃপর তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? তিনি প্রভাত রশ্মির উন্মেষক। তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসেবের জন্য রেখেছেন। এটি পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ।” (সূরা আনআম, আয়াত নং ৯৫-৯৬)

   ➧ “আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে স্থিতিশীল করেছেন এবং আসমানকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে করেছেন সুন্দর এবং তোমাদেরকে রিযিক দান করেছেন পবিত্র বস্তু থেকে। তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের রব। সুতরাং সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্ কত বরকতময় (কল্যাণময়)!” (সূরা মুমিন, আয়াত নং ৬৪)

   ➧ “তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি তার জন্য বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।” (সূরা মুমিন, আয়াত নং ৬৮)

   ➧ “আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং ওগুলোকে করেছি শয়তানদের প্রতি ক্ষেপণাস্ত্র স্বরূপ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।” (সূরা মূলক, আয়াত নং ৫)

   ➧ “নিশ্চয় আমরা কাছের আসমানকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি। এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে।” (সুরা সাফফাত, আয়াত নং ৬-৭)

   নোট: **নাসা’র** (যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিমানচালনবিদ্যা ও মহাকাশ প্রশাসন সংস্থা) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী মানুষের পর্যবেক্ষণিক সীমার মধ্যে একশ বিলিয়নেরও (১০ হাজার কোটি) বেশি গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ (অসংখ্য তারকা, ধুলাবালি, গ্যাসীয় পদার্থ নিয়ে গ্যালাক্সি গঠিত) রয়েছে। ২০২১ সালে নাসা’র নিউ হরাইজোন স্পেস প্রোবের তথ্য বিশ্লেষণ করে তৈরি ধারনামতে এই সংখ্যা ২০০ বিলিয়ন (২০ হাজার কোটি) থেকে ২ ট্রিলিয়ন (২ লক্ষ কোটি) পর্যন্ত হতে পারে। অধিকাংশ ছায়াপথের ব্যস ৩ হাজার আলোকবর্ষ থেকে শুরু করে ৩ লক্ষ আলোকবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত। ছায়াপথসমূহের মধ্যবর্তী দূরত্ব ১০ হাজার থেকে মিলিয়ন আলোকবর্ষের পর্যায়ে। ১ আলোকবর্ষ মানে আলোর এক বছরে অতিক্রান্ত পথ, যা প্রতি সেকেন্ড ১.৮৬ লক্ষ মাইল দুরত্ব অতিক্রম করে, অর্থাৎ ৫.৪ ট্রিলিয়ন (৫.৪ লক্ষ কোটি) মাইল বা ৯.৪ ট্রিলিয়ন (৯.৪ লক্ষ কোটি) কিলোমিটার দুরত্ব। সুতরাং মহাবিশ্ব কত বড় হতে পারে সেটি ধারনা করা যেতে পারে। একটি আদর্শ ছায়াপথে ১০ মিলিয়ন (১ কোটি) থেকে এক ট্রিলিয়ন (১ লক্ষ কোটি) পর্যন্ত তারা থাকে। আমাদের সৌরজগত মিল্কিওয়ে নামক ছায়াপথে অবস্থিত যা নিকটবর্তী প্রতিবেশী ছায়াপথ অ্যান্ড্রোমিডা থেকে ২৫ লক্ষ আলোকবর্ষ দুরত্বের দ্বারা বিচ্ছিন্ন। (নাসা’র ওয়েবসাইট, মার্চ ২০২১, solarsystem.nasa.gov)

   এ সংক্ষিপ্ত তথ্য থেকে আমরা মহাপরাক্রান্ত ও প্রতাপান্বিত স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহর অসীম শক্তি, ক্ষমতা ও তাঁর নিপুন সৃষ্টি-কুশলতা ও হাজারো বৈচিত্র্যের কথা ভেবে বিস্ময়ে হতবাক হই। এবং তিনিই যে প্রকৃত মা’বুদ (উপাস্য) হবার একমাত্র হকদার তা বুঝতে পারি। অধিকন্তু, শাফায়াত বা সুপারিশের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে এই পৃথিবীর সমান দশগুণ (১০) বিস্তৃত জান্নাতের যায়গা প্রদান করা যে তাঁর পক্ষে কোনো ব্যাপারই নয়, তার দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করতে পারি। (বুখারী, মুসলিম, মেশকাত হা/৫৩৪৭ দ্রষ্টব্য)

   নাসার বিজ্ঞানীরা সহ বর্তমান আধুনিক যুগের সকল বিজ্ঞানী পৃথিবী নামক গ্রহের গবেষণা অনেকটা কমিয়ে দিয়ে মহাকাশ তথা গ্যালাক্সি সহ ঊর্ধ্বজগতের গবেষণায় বিভোর। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে তারা মহান আল্লাহ তা’আলার সৃষ্ট জগৎসমূহের বা তার সৃষ্টি রহস্যের কূলকিনারা করতে সক্ষম হচ্ছে না এবং তা করা তো দুরের কথা এর ধারে কাছেও পৌঁছাতে সক্ষম হবে না, এটা দিবালোকের মত সত্য হলেও তাদের অধিকাংশই মহাক্ষমতাধর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিচ্ছে না। এটাই একটা বিস্ময়ের ব্যাপার, একথা আল্লাহ তা’আলা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে পৃথিবীবাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, “আর আমরা তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে তা দ্বারা তারা শুনে না; তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চেয়েও বেশী বিভ্রান্ত । তারাই হচ্ছে গাফেল।” (সূরা আরাফ, আয়াত নং ১৭৯)

   ইমাম গাজ্জালীসহ বহু গুরুজন আল্লাহর সৃষ্টি বিশেষ করে মহাকাশে তাঁর অসংখ্য বিশাল সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে উৎসাহিত করেছেন। একাজ মু’মিনের ঈমানকে ইয়াকীনের স্তরে উন্নীত করতে এবং ফলভারে অবনত বৃক্ষের মত জ্ঞানভারে সমৃদ্ধ মু’মিনকে ভক্তি শ্রদ্ধায় দেহমনে একাত্ম হয়ে প্রভুর ইবাদত/আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ হতে ও তাঁরই উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হতে একান্ত সহায়ক। আর এরূপ মু’মিন ব্যক্তিরাই প্রকৃত জ্ঞানী/বুদ্ধিজীবি বলে মহান আল্লাহ্‌ তাদের প্রশংসা করেছেন সূরা আলে-ইমরানের শেষাংশে।

   ➧ “নিশ্চয় আমরা তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম পাথর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয় ; তাদেরকে আমরা উদ্ধার করেছিলাম রাতের শেষাংশে, আমাদের পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ ; যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আমরা এভাবেই তাকে পুরস্কৃত করে থাকি।” (সূরা ক্বামার, আয়াত নং ৩৪-৩৫)

   ➧ “আমরা বললাম, ‘হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।’” (সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং ৬৯)

   ➧ “তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে বা যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সবাই আল্লাহ্‌র নিকট সমান।” (সূরা রাদ, আয়াত নং ১০)

   ➧ “তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিজলী, ভয় ও আশা-আকাংখারূপে এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ভারী মেঘ।” (সূরা রাদ, আয়াত নং ১২)

   নোট: উপরোক্ত ৩টি সূরার (ক্বামার, আম্বিয়া ও রাদ) ৫টি আয়াতে আমরা মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর সৃষ্টি অগ্নি, বায়ু, বিদ্যুৎ ও পানি/মেঘমালার উপর তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রন/পরিচালনার বিষয়ে স্পষ্ট ধারনা লাভ করি। অধিকন্ত, মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য অবস্থান ও কথাবার্তা কোন কিছুই ঐসব শক্তি/বস্তুর নিয়ন্ত্রক আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতার আওতা বহির্ভূত নয় তা জেনে আল্লাহভীতি (তাক্বওয়া) অবলম্বনের বিষয়ে আমরা অনুধাবন করি। ম্যাচের কাঠিতে ঘর্ষণ দিলেই আগুন জ্বলে ওঠে। পানি/বাষ্প সহ উক্ত ৪টি সৃষ্টিই অলক্ষে আমাদেরকে বাস্তবে সবদিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে যা আমরা ভেবে দেখি না।

   ➧ “তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না, তিনি কিভাবে ছায়াকে বিলম্বিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এরপর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। অতঃপর আমি একে নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি। (সূরা ফুরকান, আয়াত নং ৪৫-৪৬)

   **অনুবাদকের সংযোজন: (খ) তাওহীদ-আল-উলুহিয়্যাহ**

   তাওহীদ-আল-উলুহিয়্যাহ বুঝার জন্য সংশ্লিষ্ট আয়াত, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

   ➧ “আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে।” (সূরা যারিয়াত, আয়াত নং ৫৬)

   ➧ “তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই। কাজেই তোমরা তাঁকেই ডাক, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই।” (সূরা মুমিন, আয়াত নং ৬৫)

   ➧ “আমিই আল্লাহ আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব আমার এবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর।” (সুরা ত্বহা, আয়াত নং ১৪)

   ➧ “আর তোমাদের ইলাহ্‌ এক ইলাহ্‌, দয়াময়, অতি দয়ালু তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্‌ নেই।” (সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৬৩)

   ➧ “আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত কোন প্রকৃত ইলাহ্‌ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ২) “তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্‌ নেই; (তিনি) প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ৬)

   ➧ “আল্লাহ্‌ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহ্‌ও নেই; যদি থাকতো তবে প্রত্যেক ইলাহ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো। তারা যে গুণে তাকে গুণান্বিত করে তা থেকে আল্লাহ্‌ কত পবিত্র- মহান!” (সূরা মুমিনুন, আয়াত নং ৯১)

   ➧ আপনি কি দেখেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যারা আছে তারা এবং সারিবদ্ধভাবে উড্ডীয়মান পাখীরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তার ‘ইবাদতের ও পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি। আর তারা যা করে সে বিষয় আল্লাহ্‌ সম্যক অবগত। (সূরা নূর, আয়াত নং ৪১)

   ব্যাখ্যা: পৃথিবী ও আকাশবাসীরা যেভাবে আল্লাহর আদেশ পালন ও তাঁর মহিমা বর্ণনা করে, সব কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্তে রয়েছে। এ কথা বলে যেন মানব-দানবকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তোমাদেরকে আল্লাহ বিবেক ও ইচ্ছার স্বাধীনতা দান করেছেন। অতএব আল্লাহর মহিমা, প্রশংসা ও আনুগত্য অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় তোমাদেরকে বেশী করা উচিত। কিন্তু বাস্তব তার বিপরীত। অন্য সৃষ্টিরা আল্লাহর মহিমা-গানে ব্যস্ত থাকে; কিন্তু বিবেক ও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সুশোভিত সৃষ্টি এতে অলসতার শিকার। যার কারণে তারা অবশ্যই আল্লাহর পাকড়াও-যোগ্য। (সংক্ষেপিত, তাফসীরে আহসানুল বায়ান)

   **অনুবাদকের সংযোজন: (গ) তাওহীদ-আল-আসমা ওয়াস সিফাত**

   তাওহীদ-আল-আসমা ওয়াস সিফাত বুঝার জন্য সংশ্লিষ্ট কিছু আয়াত, হাদীস নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

   ➧ আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যার শ্রবণশক্তি সকল শব্দতে পরিব্যাপ্ত। একদা এক মহিলা তার অভিযোগ নিয়ে নবী (ﷺ) এর কাছে আসে। তখন আমি ঘরের এক কোণে অবস্থানরত ছিলাম। সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, কিন্তু আমি তার বক্তব্য শুনতে পাইনি। তখন আল্লাহ্‌ তা’আলা (সাত আসমানের উপর থেকে তার কথা শুনে নিয়ে) এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ), “আল্লাহ্‌ অবশ্যই সেই নারীর কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে...” (সূরা মুজাদালা, আয়াত নং ১)।’ (নাসায়ী হা/ ৩৪৬০, ইবনে মাজাহ, হা/ ১৮৮)

   নোট: নামাযের মধ্যে মুমিন ব্যক্তি রুকু থেকে দাড়িয়ে উঠার সময় পড়েন “সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ”, অর্থাৎ ‘যে কেউ তার প্রভূর প্রশংসা করে আল্লাহ তা শুনেন’ (বুখারী ৬৯৬, ইফা, সংক্ষেপিত), মা আয়েশা (রা.) বর্ণিত উক্ত হাদীসের শিক্ষা ‘প্রতিটি শব্দে আল্লাহর শ্রবণশক্তি পরিব্যাপ্ত’ এই কথার সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি দিয়ে থাকেন।

   ➧ আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ্‌ (ﷺ) বলেছেন, “তাঁর পর্দা (অন্তরাল) হল নূর (জ্যোতি বা আলো)। যে পর্দা উন্মোচিত হলে তাঁর আনন-দীপ্তি সমস্ত সৃষ্টিকুলকে দগ্ধীভূত করে ফেলবে।” (মুসলিম ৪৬৩)

   ➧ উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রসুলুল্লাহ্‌ (ﷺ) বলেছেন, “মরণের পূর্বে কখনোই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে না।” (আহমাদ ২২৭৬৪, সহীহুল জা’মে ২৪৫৯)

   ➧ “দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না, কিন্তু দৃষ্টিসমূহ তাঁর আয়ত্বে আছে এবং তিনিই সুক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।” (সূরা আন’আম, আয়াত নং ১০৩)

   ➧ “কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্‌ তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন ওহীর (প্রত্যাদেশ) মাধ্যম ব্যতিরেকে, অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা কোন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে; আর তখন আল্লাহ্‌ যা চান তা তাঁর অনুমতিক্রমে অহী (প্রত্যাদেশ) করেন; নিঃসন্দেহে তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।” (সূরা শুরা, আয়াত নং ৫১)

   ➧ “নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল।” (সূরা নাজ্‌ম, আয়াত নং ১৩)

   ➧ “অবশ্যই সে তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দর্শন করেছে।” (সূরা তাকবীর, আয়াত নং ২৩)

   ➧ মা আয়েশা (রাঃ) বললেন, ‘আল্লাহর কসম! আমি এব্যাপারে আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন:”তিনি হলেন জিবরীল। তাঁকে ঐ দুইবার ছাড়া অন্য বারে তাঁর সৃষ্টিগত আসল রূপে দর্শন করিনি। যখন তিনি আসমানে আবতরণরত ছিলেন, তাঁর বিরাট সৃষ্টি আকৃতি আকাশ-পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানকে ঘিরে রেখেছিল।” (মাসরূক বর্ণিত, মুসলিম ৪৫৭, তিরমিযী ৩০৬৮) [↑](#footnote-ref-1)
2. **অনুবাদকের সংযোজন: রেসালাতের শাহাদাহ্‌ বা সাক্ষ্য- একজন মুসলিমের স্বীকারোক্তি**

   রেসালাতের শাহাদাহ্‌ বা সাক্ষ্য সংশ্লিষ্ট আয়াত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

   ➧ “বলুন, ‘হে মানুষ! **নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল**, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই; তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। **কাজেই তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূল উম্মী নবীর প্রতি যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহে ঈমান রাখেন।** আর তোমরা তাঁর অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও’।” (সূরা আরাফ, আয়াত নং ১৫৮)

   **কালেমা তাইয়্যেবার শাহাদাহ্‌ ও সীকারোক্তির ফজিলত (মর্যাদা), সংশ্লিষ্ট আয়াত, হাদীস ও (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) তার ব্যাখ্যা নোটসহ উপস্থাপিত হলো:**

   **➧ “অতএব তুমি জেনে রাখ যে আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন প্রকৃত মাবুদ বা উপাস্য নেই।”** (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত নং ৯)

   **ব্যাখ্যা:** এখানে জেনে রাখো বলতে উপরে বর্ণিত তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ত্ববাদ সম্পর্কিত জ্ঞান ও বিশ্বাস সহকারে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' এর ঘোষণা, সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি প্রদান উদ্দেশ্য যা মানব সন্তানের প্রধানতম দায়িত্ব ও অপরিহার্য বা ফরয কর্তব্য।

   **➧ “মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়। আর উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের।”** (সূরা আছ্‌র, আয়াত নং ১-৩)

   **➧ “যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।”** (সূরা বায়্যিনাহ্‌, আয়াত নং ৭-৮)

   **➧ “যে ব্যক্তি মু’মিন অবস্থায় সৎকর্ম নিয়ে উপস্থিত হবে, তাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চমর্যাদা।”** (সূরা ত্বা-হা, আয়াত নং ৭৫)

   ➧ “নিশ্চয় যারা বলে, ‘আমাদের রব (প্রতিপালক, পালনকর্তা) আল্লাহ’, তারপর অবিচল থাকে (এই কথার উপরে), তাদের কাছে নাযিল হয় **(মৃত্যুর সময়, কবরে এবং পুনরুত্থানের সময়)** ফেরেশতা (এই বলে) যে, 'তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। আর সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে যা কিছু তোমাদের মন চাইবে এবং **সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে যা তোমরা দাবী করবে। এটা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন।**” (সূরা ফুস্‌সিলাত, আয়াত নং ৩০-৩২)

   **➧ “হে আমার বান্দাগণ! যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে এবং আত্মসমর্পণ করেছিলে, আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং কোন চিন্তাও নেই। তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিনীরা জান্নাতে প্রবেশ করো, আজ তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করা হবে।”** (সূরা যূখরুফ, আয়াত নং ৬৯-৭০)

   **➧ “(সকল) মান-সম্মান কেবলমাত্র আল্লাহর এবং তাঁর রসূল ও মু’মিনদের জন্যই নির্দিষ্ট; কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।”** (সূরা মুনাফিকূন- ৮)

   **➧ “এটা এজন্য যে, যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্‌ই তাদের অভিভাবক; নিশ্চয় কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই।”** (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত নং ১১)

   **➧ “আমার কর্তব্য হচ্ছে মু’মিনদেরকে সাহায্য করা।”** (সূরা রূম, আয়াত নং ৪৭

   ➧ হুযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্‌ (ﷺ) বলেছেন, **“ঈমানের সত্তর বা ষাটের অধিক শাখা** রয়েছে। এর মধ্যে **সর্বোত্তম শাখা হলো এ কথা বলা যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ্‌ বা উপাস্য নেই। আর সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।”** (বুখারী হা/৮, মুসলিম হা/১৬০)

   ➧ হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (ﷺ) বলেছেন, “কোন বান্দা এমন নেই যে, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌’ বলে আর তার জন্য আকাশসমূহের দরজাগুলো খুলে যায় না। এমনকি এ কালেমা সোজা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তবে শর্ত হচ্ছে, এর পাঠকারী কবীরাহ্‌ গুনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকবে।” (তিরমিযী হা/৩৫৯০, সহীহ্‌ জামিঊস সাগীর হা/৫৬৪৮)

   ➧ মু'আয (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি **সত্য-চিত্তে (ইখলাসের সাথে)** 'আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্‌' বলবে, **সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।**” সবাই জিজ্ঞাসা করে, **‘ইখলাসের অর্থ কি?’ তিনি (ﷺ) বলেন, “ইখলাসের অর্থ হলো এই যে, কালেমা তৈয়্যেবা পাঠ করার পর ঐ ব্যক্তি আল্লাহর দ্বারা হারাম বলে ঘোষিত বস্তুর উপভোগ থেকে ক্ষান্ত হয়ে যাবে।”** (আহমাদ ২২০০৩, বাইহাক্বীর শুয়াবুল ঈমান ৭, সিলসিলাহ্‌ সহীহাহ ২২৭৮, তারগীব ও তারহীব)

   আর মুসনাদ আহমাদ-এ রেফা'আজ-এর যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে তার ভাষা হলো এই, “যে ব্যক্তি সাচ্চা মনে এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য দেয় যে আমি [মুহাম্মদ (ﷺ)] আল্লাহর রসূল আর **তারপর সোজা রাস্তায় (সিরাতুল মুস্তাকীম) চলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।**”

   ➧ উসমান (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেন, “যে ব্যক্তি 'আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই' এ কথা জানা অবস্থায় মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (মুসলিম ১৪৫, আহমাদ ৪৬৪)

   ➧ মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, ”যার শেষ কথা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (আহমাদ ২২০৩৪, আবূ দাঊদ ৩১১৮, হাকেম ১২৯৯, সহীহুল জামে ৬৪৭৯)

   ➧ হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (ﷺ) বলেছেন, “তোমরা তোমাদের মৃত্যু পথযাত্রীকে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌’ তালকীন করাও। কেননা **যে ব্যক্তির মৃত্যুর সময় শেষ কথা হবে ‘লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্‌’, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।**” (হাদীস: হাসান, ইবনু হিব্বান হা/৩০০৪, ইরওয়াউল গালীল হা/৬৮৭)

   ➧ হযরত উবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিজে রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন প্রকৃত মাবূদ নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর রসূল, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন।” (মুসলিম, মারিফুল হাদীস)

   **ব্যাখ্যা:** উপরোক্ত হাদীসসমূহে তাওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্য দানের অর্থ হচ্ছে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে নেয়া এবং সে অনুযায়ী চলা। **অন্য শব্দে একথাও বলা যায় যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌'-এ কথার সাক্ষ্য দানের মধ্যে সম্পূর্ণ ইসলাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।** যে ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করে এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছে, সে আসলে পূর্ণ ইসলামকে নিজের দ্বীন (জীবনব্যবস্থা) বানিয়ে নিয়েছে। এখন যদি **একান্তই মানবীয় দূর্বলতার কারণে** তাঁর পক্ষ থেকে কোন ক্রটি-বিচ্যুতি হয়েই যায়, তাহলে তাঁর ঈমানী অনুভূতিই তাকে শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় **কাফ্‌ফারা আদায় করে অথবা তওবা করে পবিত্র হয়ে যেতে বাধ্য করবে।** তাই সে যদি পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে জাহান্নামের আযাব থেকে নিরাপদই থাকবে।

   এ মূলনীতির আলোকে এই ধরণের হাদীসমূহের উদ্দেশ্য কেবল এতটুকুই যে, তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্যদানের নিজস্ব দাবী এটাই যে, এর দ্বারা মানুষ জাহান্নামের আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে এবং জান্নাতে যাবে। কিন্তু সে যদি দূর্ভাগ্যবশতঃ এমন কিছু খারাপ আমলও করে থাকে, যেগুলোর নিজস্ব দাবী শাস্তি পাওয়া এবং জাহান্নামে যাওয়া বলে কুর'আনে বলা হয়েছে, তাহলে এগুলোও তাঁর নিজস্ব কিছু না কিছু প্রভাব দেখিয়েই ছাড়বে। **এই ছোট তত্ত্ব কথাটি স্মরণে রাখলে সুসংবাদ ও সতর্কবাণী এবং ভয় প্রদর্শন সম্পর্কীয় শত শত হাদীসের বেলায় মানুষের মধ্যে যে ভূল বুঝাবুঝি এবং এর কারণে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়, ইনশাল্লাহ্‌ তা আর থাকবে না।** (মাওলানা মনযূর নুমানী, মারিফুল হাদীস, প্রথম খন্ড হা/১১, ১৮)

   ➧ ওহ’ব বিন মুনাব্বেহ্‌ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাকে [মুহাম্মদ (ﷺ)] জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ‘আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন মা’বুদ নাই (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্‌)’ **এই কালেমা কি বেহেশতের কুঞ্জি নহে (সুতরাং আপনি আমলের জন্য এত তাকীদ করেন কেন?)**? উত্তরে তিনি বললেন, ‘নিশ্চয় (ইহা কুঞ্জি); কিন্তু প্রত্যেক কুঞ্জিরই দাঁত থাকে। যদি তুমি দাঁতওয়ালা কুঞ্জি নিয়ে যাও, তবেই তো তোমার জন্য (বেহেশতে দরজা) খোলা হইবে; অন্যথায় উহা তোমার জন্য খোলা যাইবে না **(আর কালেমার দাঁত হইলো আমল )**।’ (বুখারী, মিশকাত ১ম খন্ড হা/৩৯)

   ➧ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “জাহান্নাম থেকে ঐ ধরণের সকল মানুষকেই বের করে আনা হবে, **যারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলেছিল** এবং যাদের অন্তরে **যবের দানা পরিমাণ** পূণ্যও ছিল। তারপর ঐ সব লোকদেরকেও বের করে আনা হবে, **যারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলেছিল** এবং তাদের অন্তরে **গমের দানার** সমান পূণ্যও ছিল। তারপর ঐ সব লোকদেরকেও বের করে আনা হবে, **যারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলেছিল** এবং তাদের অন্তরে **অণু পরিমাণ** পূণ্যও ছিল।” (বুখারী, মুসলিম)

   **ব্যাখ্যা:** পূর্বে উল্লেখিত অনেক হাদীসের ব্যাখ্যায় যেমন বিস্তারিতভাবে ও প্রামাণ্যরূপে লিখা হয়েছে, তেমনিভাবে এ হাদীসেও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা দ্বারা ইসলাম কবুল করা এবং এর স্বীকৃতি প্রদান করাই উদ্দেশ্য। এর ভিত্তিতে হাদীসের মর্ম এটাই হয় যে, **যেসব মানুষ ইসলামের কালেমা পাঠ করে এবং নিজেদেরকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত রাখে, আর তাদের অন্তরে অণু পরিমাণ পূণ্য (অর্থাৎ ইসলামের আলো) থাকে, তারাও শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে আসবে।** এ হাদীসে তিনটি স্থানে 'খায়র' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অনুবাদ আমরা 'পূণ্য' শব্দ দিয়ে করেছি। কিন্তু হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীসেরই অন্য এক রেওয়ায়তে (যেটি ইমাম বুখারীও উল্লেখ করেছেন) 'খায়র' শব্দের স্থলে 'ঈমান' শব্দও এসেছে, যা একথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, **এখানে পূণ্য দ্বারা ঈমানের আলোই উদ্দেশ্য।**

   এ হাদীস দ্বারা হকপন্থীদের দু'টি বিশেষ ও সর্বসম্মত এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ আকীদার কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানা যায়। প্রথম বিষয়টি এই যে, **অনেক কালেমা পাঠকারী লোক নিজেদের বদ আমলের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।** দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, তাদের অন্তরে যদি হালকা এবং দুর্বল এমনকি হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী অণু পরিমাণ ঈমানও থাকে, তাহলে শেষ পর্যন্ত তারা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসতে পারবে। **এটা হতে পারে না যে, কোন অতি নিম্ন স্তরের ঈমানদারও কাফের-মুশরিকদের মত চিরকাল জাহান্নামে পড়ে থাকবে, তারা আমলের বিবেচনায় যত বড় ফাসেক ও পাপাচারীই হোক না কেন।**

   যা হোক, হাদীস বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং উলূমুল হাদীসে পারদর্শী লোকদের নিকট এ বিষয়টি হুযূর (ﷺ) থেকে সন্দেহাতীত ধারাবাহিকতায় প্রমাণিত; বরং বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর যে বিস্তারিত বর্ণনাটি পাওয়া যায়, সেখানে স্পষ্টভাবে এ কথারও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, যেসব পাপী মুসলমান জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তাদের জন্য জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত মুমিনরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে খুবই অনুনয় বিনয়ের সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রার্থনা জানাবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এই অনুরোধ ও প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাদেরকেই অনুমতি দিয়ে বলবে, ‘যাও, তোমরা যার মধ্যে এক দীনার পরিমাণও কল্যান দেখ তাকেই বের করে নিয়ে আস।’ ফলে এ ধরণের প্রচুর সংখ্যক লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসা হবে। তারপর আবার তাদেরকে বলা হবে, এবার গিয়ে দেখ, যাদের মধ্যে অর্ধ দীনার কল্যাণেরও সন্ধান পাও তাদেরকেও বের করে নিয়ে আস। এর ফলে এ ধরণের প্রচুর সংখ্যক লোককে বের করে নিয়ে আসা হবে। তারপর আবার হুকুম হবে যে, যাও এমন লোকদেরকেও বের করে নিয়ে এসো যাদের মধ্যে অণু পরিমাণ কল্যাণও তোমরা দেখতে পাও। এর ফলে এমন স্তরের অনেক লোককে বের করে আনা হবে। পরিশেষে এই সুপারিশকারীরাই নিবেদন করবেঃ হে প্রতিপালক! আমরা জাহান্নামে এমন কাউকে আর ছেড়ে আসিনি যার অন্তরে কিছুটা কল্যাণ (তথা ঈমানের নূর) আছে। **তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন: ফেরেশতারাও সুপারিশ করেছে, নবীরাও সুপারিশ করেছে এবং মু'মিনরাও সুপারিশ করেছে। এখন কেবল পরম দয়াময় (আল্লাহ্‌ তা'আলা) এর পালাই অবশিষ্ট। এই বলে স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর রহ্‌মত ও ক্ষমার হাতে এমন লোকদেরকেও বের করে নিয়ে আসবেন, যারা কখনো কোন নেক আমলই করেনি।** হযরত আবূ সাইদ খুদরী (রাঃ) এর এ হাদীসের শেষে ঐসব লোকদের ব্যাপারে এ কথাটিও রয়েছেঃ এরা হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত লোক। আল্লাহ্‌ তা'আলা এদেরকে কোন আমল ও কল্যাণের বিনিময় ছাড়াই জান্নাতে দাখিল করবেন।

   **এরা হবে ঐসব লোক, যাদের কাছে খুবই দুর্বল ও ক্ষীণ ঈমান ছাড়া নেক আমল ও পুণ্যের কোন পুঁজিই থাকবে না; কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা শেষ পর্যন্ত নিজ দয়া ও অনুগ্রহে তাদেরকেও জান্নাতে দাখিল করে দিবেন।**

   ➧ হুযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার অন্তরে ইসলাম গ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি করে দিলেন, তখন আমি রসূলুল্লাহ্‌ (ﷺ) এর খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলাম, আপনার ডান হাতটি বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করব। তিনি তখন নিজের ডান হাতটি বাড়িয়ে দিলেন; কিন্তু আমি হাত ফিরিয়ে নিলাম। হুযূর (ﷺ) বললেন, “হে আমর! তোমার কি হল? (অর্থাৎ, তুমি তোমার হাত কেন ফিরিয়ে নিলে?)” আমি নিবেদন করলাম, **আমি একটি শর্ত লাগাতে চাই। তিনি বললেন, “তুমি কি শর্ত আরোপ করতে চাও?” আমি আরয করলাম, আমাকে যেন ক্ষমা করে দেওয়া হয়। তখন তিনি বললেন, “হে আমর! তোমার কি একথা জানা নেই যে, ইসলাম গ্রহণ পূর্ববর্তী সকল গুনাহ্‌কে ধ্বংস করে দেয়, হিজরতও পূর্ববর্তী গুনাহ্‌সমূহকে শেষ করে দেয় এবং হজ্জও পূর্ববর্তী গুনাহ্‌সমূহকে দূর করে দেয়।”** (মুসলিম শরীফ)

   **ব্যাখ্যা:** হুযূর (ﷺ) গুনাহ্‌মাফীর ক্ষেত্রে ইসলাম ছাড়া হিজরত এবং হজ্জের প্রভাবের কথা এই স্থানে এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য বলেছেন যে, ইসলাম তো ইসলামই; এর কোন কোন আমলের মধ্যেও গুনাহ্‌ থেকে পবিত্র করে দেওয়ার শক্তি রয়েছে। **তবে এখানে দু'টি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়ঃ (১) ইসলাম গ্রহণ এবং হিজরত অথবা হজ্জ করার এই প্রভাব ঐ অবস্থায় প্রতিফলিত হবে, যখন এ কাজগুলো খাঁটি নিয়্যতে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হবে। (২) শরী'অতের দলীল-প্রমাণ দ্বারা এ কথা স্বস্থানে স্বীকৃত যে, কারো জিম্মায় যদি আল্লাহর বান্দাদের কোন হক থাকে, বিশেষ করে অর্থ সংক্রান্ত হক থাকে, তাহলে ইসলাম গ্রহণ অথবা হিজরত কিংবা হজ্জের দ্বারা এ হক মাফ হবে না। এ ব্যাপারটি পাওনাদারদের নিকট থেকে পরিস্কার করে নিতে হবে।**

   কুফ্‌র ও শির্কের জীবন থেকে তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করলে যে অতীতের গুনাহ্‌ মাফ করে দেওয়া হয়, এর প্রতিশ্রুতি কুর'আন শরীফেও দেওয়া আছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন, “হে রসূল! আপনি ঐসব লোকদের বলে দিন, যারা কুফ্‌রীতে লিপ্ত রয়েছে, **তারা যদি (কুফ্‌রী থেকে) ফিরে আসে, তাহলে তাদের অতীতের গুনাহ্‌ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।**” (সূরা আনফাল , আয়াত নং ৩৮)

   ➧ “তারপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে আমলকারী কোন নর বা নারীর আমল বিফল করি না [১]; তোমরা একে অপরের অংশ। কাজেই যারা হিজরত করেছে, নিজ ঘর থেকে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে আমি তাদের পাপ কাজগুলো অবশ্যই দূর করব [২] এবং অবশ্যই তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। এটা আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার; আর উত্তম পুরস্কার আল্লাহরই কাছে রয়েছে।” (সূরা আলে ইমরান , আয়াত নং ১৯৫)

   **ব্যাখ্যা:** [১] উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন: আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের হিজরত সম্পর্কে কোন কিছু বলেন না কেন? তখন আল্লাহ তা’আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [মুস্তাদরাক হাকেমঃ ২/৩০০] [২] অর্থাৎ আল্লাহর হকের বেলায় যে সমস্ত ক্রটি গাফলতী ও পাপ হয়ে থাকবে তা হিজরত ও শাহাদাতের মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে। তার কারণ, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে ঋণ বা ধারকে এ থেকে পৃথক করে দিয়েছেন। বান্দার হক থেকে ক্ষমা পাওয়ার নিয়ম হল স্বয়ং পাওনাদার কিংবা তার উত্তরাধিকারীকে প্রাপ্য পরিশোধ করে দেবে অথবা তাদের কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেবে। অবশ্য **যদি কারো প্রতি আল্লাহ তা’আলা বিশেষ অনুগ্রহ করে পাওনাদারকে রাযী করিয়ে দেন, তবে তা স্বতন্ত্র কথা।** (তাফসীরে আবু বকর যাকারিয়া)

   ➧ হুযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (ﷺ) বলেছেন, **“যে ব্যক্তি ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌’ বলবে, একদিন না একদিন এই কালেমা অবশ্যই তার উপকারে আসবে। যদিও ইতিপূর্বে তাকে কিছুটা শাস্তি ভোগ করতে হবে।”** (হাদীস সহীহঃ বাযযার হা/৮২৯২, সহীহ আত-তারগীব হা/১৫২৫, ত্বাবারানী হা/১৪০)

   উক্ত হাদীসের আলোকে মুহাদ্দিসীনগণের অভিমত: ঈমান জানা ও উপলব্ধির নাম, আর ইসলামের আমলসমূহ বাস্তবে ঈমানকে রূপদানের নাম। ঈমান বৃক্ষসরূপ, আর অন্যান্য আমলসমূহ তার ডালপালার মতো। যে ব্যক্তি উক্ত কালেমা আন্তরিকতার সাথে বলবে সে গুনাহগার হলেও কোন একসময় জান্নাত পাবে। কিন্তু “রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, ‘তোমাদের কাউকেই তার ‘আমল (‘ইবাদাত-বন্দেগী) মুক্তি দিতে পারবে না।’ সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, “ইয়া রাসুলুল্লাহ (ﷺ)! আপনার ক্ষেত্রেও কি তাই?”, নবীজি (ﷺ) জবাবে বললেন, “হ্যা, আমার ক্ষেত্রেও তাই, যদি না আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে নেন, তবুও তোমরা সঠিকভাবে ‘আমল করতে থাকবে ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতে কিছু ‘আমল করবে। সাবধান! তোমরা (‘ইবাদাতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে, মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। তাতে তোমরা তোমাদের মঞ্জীলে মাকসূদে পৌঁছে যাবে।’।” (সহীহ: বুখারী ৬৪৬৩, মুসলিম ২৮১৬) সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া ব্যতীত কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না তাহলে আমাদেরকে আমল করতে হবে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং তার নির্দেশের জন্য আর সর্বদা আত্মসমর্পিত অবস্থায় থেকে আল্লাহর রহমতের আশায় থাকতে হবে। আল্লাহ এই তৌফিক দিন।

   ➧ “পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোই সৎকর্ম নয়, কিন্তু সৎকর্ম হলো যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌, শেষ দিবস, ফেরেশ্‌তাগণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনবে। আর সম্পদ দান করবে তার ভালবাসায় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করবে, অর্থ-সংকটে, দুঃখ-কষ্টে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করবে। তারাই সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই মুত্তাকী।” (সুরা বাকারা, আয়াত নং ১৭৭)

   **নোট:** উপরের মূল অনুবাদে আল্লাহর সাথে ৪র্থ দফার অঙ্গীকারনামায় রসূলের আনুগত্য ও তাঁর প্রদর্শিত পথে ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে সৎকাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সূরা কাহাফের আয়াতে। একইভাবে সূরা বাকারার উক্ত আয়াতে ঈমানের ছয়টি রুকনের মধ্যে পাঁচটি রুকনের উল্লেখ করে তৎসঙ্গে পাঁচটি প্রধানতম সৎকাজের কথা বলা হয়েছে। ঈমানের সাথে যারা ঐসব সৎকাজ সম্পাদন করবে, তাদেরকে সত্যপরায়ণ ও মুত্তাক্কী বলে আল্লাহ্‌ পাক সার্টিফিকেট দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈমানের সাথে সৎকাজ সম্পাদন ঈমানের অবিচ্ছেদ্দ্য অংশ। ঈমানের অর্থ শুধু আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করাই নয়। বরং সহীহ হাদীসের বর্ণনার আলোকে ষাটের অধিক ঈমানের শাখার মধ্যে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলে ঈমান আনাকে তার সর্বোচ্চ স্তর এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলাকে তার সর্বনিম্ন স্তর বলা হয়েছে। সে কারণেই উপরের অনূদিত অংশে মূল লেখকবৃন্দ ঈমান বলতে অন্তরের বিশ্বাস, মুখে হৃদয় দিয়ে সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের দ্বারা রসূলের সুন্নাহ্‌ (যা আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রদত্ত আইনসম্মত বিষয়াদি, নির্দেশনা, ইবাদত ইত্যাদি) মোতাবেক আমল বাস্তবায়নের কথা বলেছেন। তদ্রুপ আমলের স্তর অনুপাতে ব্যক্তি মুসলিম, মু’মিন (যারা পহেযগার বা মুত্তাক্কী) বা মুহসীনের উচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারে। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে, নবীজির (ﷺ) যামানায় মুনাফিক ও মুশরিক মুগীরা, ওতবা, শাইবা ও আবূ জেহেলের মত নেতারা কথায় কথায় আল্লাহর নাম নিয়ে বা তাঁর শপথ করে কথা বলতো। কুরআনের বর্ণনায় বুঝা যায় যে তারাও আল্লাহ্‌র তাওহীদে রবুবিয়্যাহ বা প্রভুত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলো, কিন্তু তাঁর ইবাদাৎ ও গুনাবলীর একত্ববাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর সৃষ্টিকে সমকক্ষ বা অংশীদার গন্য করতো। তদুপরি রেসালাত ও অন্যান্য দ্বীনী বিষয় অস্বীকার করতো। সেসব কারনে প্রকৃত ঈমানদার হবার পরিবর্তে তারা ছিলো মুশরিক। যে কারণে তাদের বিরূদ্ধে রাসূল (ﷺ) এর নেতৃত্বে জিহাদ হয়েছে।

   ➧ আব্দুল্লাহ্‌ বিন উমার কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্‌ (ﷺ) বলেছেন, “অবশ্যই তোমাদের হৃদয়ে ঈমান জীর্ণ হয়; যেমন জীর্ণ হয় পুরনো কাপড়। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌ তা’আলার কাছে প্রার্থনা কর, যাতে তিনি তোমাদের হৃদয়ে তোমাদের ঈমান নবায়ন করে দেন।” (ত্বাবারানী, হাকেম ৫, সহীহুল জামে’ ১৫৯০)

   ➧ রসূলুল্লাহ্‌ (ﷺ) বলেন, “তোমরা তোমাদের ঈমানকে নবায়ন কর।” জিজ্ঞাসা করা হলো, ”কিভাবে আমরা আমাদের ঈমানকে নবায়ন করবো?” রসূলুল্লাহ্‌ (ﷺ) বললেন, “তোমরা বলো, ‘লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্’।” (মুসতাদরাক হাকেম)

   **নোট:** প্রার্থনার সাথে সাথে জাগ্রত অবস্থায়, ঘুমানোর পূর্বে, বৈঠক অবস্থায়, শায়িত অবস্থায় এবং চলতে-ফিরতে খাস-দিলে (অর্থাৎ ইখলাসের সাথে) কালেমা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌” পাঠ করা, জিকির করা ঈমান নবায়নের এবং শুভ পরিনাম লাভের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। [↑](#footnote-ref-2)
3. **অনুবাদকের সংযোজন: আশ-শির্ক (বহু-ঈশ্বরবাদ)**

   ‘আশ-শির্ক (বহু-ঈশ্বরবাদ)’ বুঝার জন্য সংশ্লিষ্ট আয়াত, হাদীস, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা এবং নোট উপস্থাপন করা হলো:

   ➧ “যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, **আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না।** বস্তুতঃ এসব তোমরা জান।” (সূরা বাকারা, আয়াত নং ২২)

   **ব্যাখ্যা:** আয়াতে উল্লেখিত (أنداد) শব্দটি (ند) এর বহুবচন। যার অর্থ সমকক্ষ স্থির করা। এখানে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এ সমকক্ষ স্থির করাটাই শির্ক। আর শির্ক হচ্ছে সবচেয়ে বড় গোনাহ। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গোনাহ কোনটি? তিনি বললেন, ‘আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, অথচ তিনি সৃষ্টি করেছেন। [বুখারীঃ ৪৪৭৭]

   **শির্কের প্রকারভেদ:** শির্ক দু'প্রকার, যথা- **বড় শির্ক ও ছোট শির্ক।** বড় শির্ক আবার দু'প্রকার। **আল্লাহর রুবুবিয়্যাত তথা প্রভূত্বে শির্ক** করা। **আল্লাহর উলুহিয়াত তথা ইবাদাতে শির্ক** করা। আল্লাহর রুবুবিয়্যাত বা প্রভূত্বে শির্ক দু’ভাবে হয়ে থাকে –

   ১) জগতের রব বা পালনকর্তা আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার না করা। যেমন- কম্যুনিষ্ট, নাস্তিক, মুলহিদ ইত্যাদি সম্প্রদায়। আল্লাহর নাম, গুণ ও কর্মকাণ্ডকে স্বীকার না করা, যেমন- ঈসমাঈলী সম্প্রদায়, বাহাই সম্প্রদায়, বুহরা সম্প্রদায়, জাহমিয়া ও মু'তাজিলা সম্প্রদায়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌ ও বান্দার মধ্যে পার্থক্য না করে সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে এক করে দেখা। যেমন ওয়াহদাতুল অজুদে বিশ্বাসী সম্প্রদায়, যারা মনে করে যে, আল্লাহ্‌ কোন কিছুর সূরত ইখতিয়ার করে তাতে নিজেকে প্রকাশ করেন; যেমন, হুলুলী সম্প্রদায় এবং যারা বিশ্বাস করে যে, কারো পক্ষে আল্লাহর সাথে একাকার হয়ে যাওয়া সম্ভব।

   ২) জগতের রব বা পালনকর্তা আল্লাহর সত্তা, নাম, গুণাবলী ও তাঁর কর্মকাণ্ডে কাউকে সমকক্ষ নির্ধারণ করা।

   ক) আল্লাহর স্বত্ত্বার সমকক্ষ কোন সত্তা নির্ধারণ করার মত কোন শির্ক বনী আদমের মধ্যে বিরল। এ ধরণের দাবী প্রথম নমরূদ করেছিল, কিন্তু ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম-এর সাথে বিতর্কে সে তার সে দাবীর সপক্ষে যুক্তি দেখাতে ব্যর্থ হয়ে হেরে গিয়েছিল। অনুরূপভাবে ফিরআউনও প্রকাশ্যে এ ধরণের দাবী করেছিল। আল্লাহ্‌ তাকে স্বপরিবারে দলবলসহ ধ্বংস করে তার দাবীর অসারতা দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

   খ) আল্লাহর নামসমূহের কোন নাম অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করার মত শির্ক বিভিন্ন জাতিতে বিদ্যমান। যারাই তাদের উপাস্যদেরকে আল্লাহর নামের মত নাম দেয় তারাই এ ধরণের শির্কে লিপ্ত। যেমন হিন্দুগণ তাদের বিভিন্ন অবতারকে আল্লাহর নামসমূহের মত নাম দিয়ে থাকে। অনুরূপভাবে কোন কোন বাতেনী গ্রুপের লোকেরা যেমন, দ্রুজ সম্প্রদায়, নুসাইরী সম্প্রদায়, আগাখানী ঈসমাঈলী সম্প্রদায় তাদের ঈমামদেরকে আল্লাহর নামসমূহে অভিহিত করে।

   গ) আল্লাহর গুণ ও কর্মকাণ্ডকে অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করা। আল্লাহর গুণ ও কর্মকাণ্ডের কোন শেষ নেই। সেগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। আল্লাহর অপার শক্তির সাথে সম্পৃক্ত, তাঁর জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত এবং হুকুম ও শরীআতের সাথে সম্পৃক্ত।

   ১. **আল্লাহর অপার শক্তির সাথে যারা শির্ক করে** তাদের উদাহরণ হলো, ঐ সমস্ত লোকেরা যারা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টি, মৃত্যু, জীবন, বিপদাপদ থেকে উদ্ধার, উদ্দেশ্য হাসিলকারী বলে বিশ্বাস করে। যেমন, অনেক অজ্ঞ মূর্খ মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে, অনেক সূফীরা তাদের পীর সাহেব সম্পর্কে বিশ্বাস করে থাকে। অনুরূপভাবে অনেকে কবরবাসী কোন লোক সম্পর্কে এ ধরণের বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। তদ্রুপ অনেকে যাদুকর জাতীয় লোকদের সম্পর্কেও এ ধরণের বিশ্বাস করে। অনুরূপভাবে শিয়া সম্প্রদায়ও তাদের ইমামদের ব্যাপারে এ ধরণের বিশ্বাস করে।

   ২. **আল্লাহর পরিপূর্ণ জ্ঞানের সাথে যারা শির্ক করে** থাকে তাদের উদাহরণ হলো, ঐ সমস্ত লোকেরা যারা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাউকে গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করে। যেমন, অনেক অজ্ঞ মূর্খ মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু '‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে, অনেক সুফীরা তাদের পীর সাহেব সম্পর্কে বিশ্বাস করে যে তারা গায়েব জানে। আবার অনেকে কবরবাসী কোন কোন লোক সম্পর্কে এ ধরণের বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। তদ্রুপ অনেকে গণক, জ্যোতিষ, জ্বিন, প্রেতাত্মা, ইত্যাদীতে বিশ্বাস করে যে, তারাও গায়েব জানে। অনুরূপভাবে শিয়া সম্প্রদায়ও তাদের ইমামদের ব্যাপারে বিশ্বাস করে যে, তারা গায়েব জানতো।

   ৩. **আল্লাহর শরীআত ও হুকুমের সাথে যারা শির্ক করে** থাকে তাদের উদাহরণ হলো, ঐ সমস্ত লোকেরা যারা আল্লাহর মত শরীআত প্রবর্তনের অধিকার তাদের আলেম ও শাসকদের দিয়ে থাকে। যেমন, ঐ সমস্ত জাতি যারা সরকার বা পার্লামেন্টকে আল্লাহর আইন বিরোধী আইন রচনার অনুমতি দিয়েছে। অনুরূপ যারা আল্লাহর আইন পরিবর্তন করে তদস্থলে অন্য আইনে বিচার করা শ্রেয় বা জায়েয বা আল্লাহর আইন ও অন্যান্য আইন সমমানের মনে করে থাকে। শির্কের এ সমস্ত প্রকার আল্লাহর রুবুবিয়্যাত তথা প্রভূত্বের সাথে সম্পৃক্ত।

   **আল্লাহর ইবাদাতে শির্ক:** আল্লাহর ইবাদাতে শির্ক বলতে বুঝায়, আল্লাহ্‌ যা কিছু ভালবাসেন সন্তুষ্ট হন বান্দার এমন সব কথা ও কাজ আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা। যেমন আল্লাহ্‌ তাঁর কাছে দোআ করা ভালবাসেন, তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া ভালবাসেন, তাঁর কাছে উদ্ধার কামনা ভালবাসেন, তাঁর কাছে পরিপূর্ণভাবে বিনয়ী হওয়া ভালবাসেন, তাঁর জন্যই সিজদা, রুকু, সালাত, যবেহ, মানত ইত্যাদি ভালবাসেন। এর কোনকিছু যদি কেউ আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে করে তবে তা হবে আল্লাহর ইবাদাতে শির্ক। অনুরুপভাবে কেউ আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর মত ভালবাসলে, অন্য কারো কাছে পরিপূর্ণ আশা করলে, অন্য কাউকে গোপন ভয় করলেও তা শির্ক হিসাবে গণ্য হবে। যেহেতু বান্দার ইবাদাতসমূহ বিশ্বাস, কথা ও কাজের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে, সে হিসাবে ইবাদতের মধ্যেও এ তিন ধরণের শির্ক পাওয়া যায়। অর্থাৎ কখনো কখনো ইবাদত হয় মনের ইচ্ছার মাধ্যমে, আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, আবার কখনো কখনো তা সংঘটিত হয় বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। আবার কখনো কখনো তা সংঘটিত হয়ে থাকে কথাবার্তার মাধ্যমে।

   **দ্বিতীয় প্রকার শির্ক হলো: ছোট শির্ক**, কিন্তু তাও কবীরা গুনাহ্‌ হতে মারাত্মক। ছোট শির্কের উদাহরণ হলো, এ প্রকার বলা যে, কুকুর না ডাকলে চোর আসত, ‘আপনি ও আল্লাহ্‌ যা চান’, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা, সামান্য লোক দেখানোর জন্য কোন কাজ করা ইত্যাদি।

   [ইবনুল কাইয়্যেম, আল-জাওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা আনিদ দাওয়ায়িশ শাফী'; শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সুলাঈমান আত-তামীমী, আল-ওয়াজিবুল মুতাহাত্তিমাতুল মারিফাহ'; আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস গ্রন্থ থেকে সংক্ষেপিত] (তাফসীরে আবু বকর যাকারিয়া)

   ➧ মু’আয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা উফাইর নামক একটি গাধার পিঠে আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর পেছনে আরোহী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, “হে মু’আয, তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর হক/অধিকার কী? এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক/অধিকার কী?” আমি বললাম, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, “বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার হলো, বান্দা তাঁর ‘ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার হলো, তাঁর ‘ইবাদাতে কাউকে শরীক না করলে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন না।” আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ দিব না? তিনি বললেন, “তুমি তাদের সুসংবাদটি দিও না, তাহলে লোকেরা এর উপর ভরসা করেই বসে থাকবে।” তারপর মু’আয (রাঃ) এল্‌ম গোপন করার গুনাহে্‌র ভয়ে নিজের মৃত্যুর সময় এ হাদীসটি মানুষের কাছে বর্ণনা করে গিয়েছেন। (সহীহ্‌ বুখারী হা/২৮৫৬, মুসলিম হা/১৫৩)

   ➧ জাবের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম (ﷺ) বলেন, “যে ব্যক্তি কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক (শির্ক) না করে মারা যাবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক (শির্ক) করে মারা যাবে, সে ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করবে।” (মুসলিম হা/২৭৯)

   ➧ “যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মুহাম্মদ (ﷺ) ভবিষ্যতের খবর জানেন, সে আল্লাহর প্রতি বিরাট মিথ্যা আরোপ করে। অথচ আল্লাহ্‌ বলেন, “বল, আল্লাহ্‌ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।” (সূরা নাম্‌ল , আয়াত নং ৬৫, মুসলিম হা/৪৫৭, তিরমিযী ৩০৬৮)

   ➧ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি কোন ব্যাপারে তাঁকে (নবী ﷺ) বলল, ‘আল্লাহ্‌ ও আপনি যা চেয়েছেন (তাই হয়েছে)।’ তা শুনে তিনি বললেন, “তুমি তো আল্লাহর সঙ্গে আমাকে শরীক (বা সমকক্ষ) করে ফেললে! না; বরং আল্লাহ্‌ যা চেয়েছেন, তাই হয়েছে।” (আহমাদ ১৮৩৯, বুখারীর আদব ৭৮৩, ইবনে মাজাহ্‌ ২১১৭, বায়হাক্বী ৫৬০৩, সিঃ সহীহাহ্‌ ১৩৯)

   ➧ আব্দুর রহমান বিন আবূ বাক্‌রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “**আমি কি তোমাদের সব থেকে বড় গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করব না?”** আমরা বললাম, অবশ্যই সতর্ক করবেন হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, **“আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে অংশীদার গণ্য করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা।”** এ কথা বলার সময় তিনি হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এরপর (সোজা হয়ে) বসলেন এবং বললেন, **“মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া”,** দু’বার করে বললেন এবং ক্রমাগত বলেই চললেন। এমনকি আমি বললাম, তিনি মনে হয় থামবেন না। (সহীহ্‌ বুখারী, হা/ ৫৯৭৬, মুসলিম হা/৮৭, মিশকাত হা/৫০) [↑](#footnote-ref-3)
4. **অনুবাদকের সংযোজন: আল-কুফর (অবিশ্বাস, অস্বীকার, অমান্যতা, অকৃতজ্ঞতা)**

   ➧ “মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ!” (সূরা আবাসা, আয়াত নং ১)

   ➧ “আর **অকৃতজ্ঞ ছাড়া আমরা আর কাউকেও এমন শাস্তি দেই না।”** (সূরা সাবা, আয়াত নং ১৭)

   ➧ “আর স্মরণ করুন, যখন তোমাদের রব ঘোঘণা করেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে আরও বেশি দেবো। আর অকৃতজ্ঞ হলে নিশ্চয় আমার শাস্তি বড়ই কঠিন।” (সূরা ইবরাহীম, আয়াত নং ৭)

   **যে ব্যক্তি উপকার পাইয়া অপকার করে, অপকার তাহার বাড়ি ছাড়িবে না। (**বাইবেল এর ৩২ নং সংস্করণ, বুক অব প্রভার্ব ১৭:১৩) [↑](#footnote-ref-4)
5. **অনুবাদকের সংযোজন: আন-নিফাক (কপটতা বা মুনাফিকী)**

   ‘আন-নিফাক (কপটতা বা মুনাফিকী)’ বুঝার জন্য সংশ্লিষ্ট আয়াত, হাদীস, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা এবং নোট উপস্থাপন করা হলো:

   **নিফাক:** আরবীতে “নিফাক” শব্দের অর্থ কপটতা (hypocrisy)। শব্দটির মূল অর্থ গোপন করা, অস্পষ্ট করা। নিফাকে লিপ্ত ব্যক্তিকে মুনাফিক বলা হয়। অন্তরের অবিশ্বাস গোপন রেখে মুখে ঈমানের দাবী করাকে ‘কুফরু নিফাক’ বা ‘নিফাক ইতিকাদী’ বলা হয়। **নিফাক বা মুনাফিকী কুফর এর একটি বিশেষ দিক যা কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।** (সুত্র: অধ্যাপক ডঃ খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে ইসলামী আক্বীদা)

   **মুনাফিকের স্বভাব-আচরণ ও পরিণাম সম্পর্কে মহিমান্বিত কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ:**

   ➧ “আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রহিয়াছে যাহারা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনিয়াছি, কিন্তু তাহারা মু’মিন নয়; **আল্লাহ্ এবং মু’মিনগণকে অতঃপর তাহারা প্রতারিত করিতে চাহে। অথচ তাহারা যে নিজেদেরকে ভিন্ন কাহাকেও প্রতারিত করে না, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না।** তাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে। আল্লাহ্ তাহাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করিয়াছেন ও তাহাদের জন্য রহিয়াছে কষ্টদায়ক শাস্তি, **কারণ তাহারা মিথ্যাবাদী।** তাহাদের যখন বলা হয়, পৃথিবীতে আশান্তি সৃষ্টি করিও না **তাহারা বলে আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী।** সাবধান! ইহারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু ইহারা বুঝিতে পারে না। যখন তাহাদেরকে বলা হয়, যে সকল লোক (নবীজির সাহাবিরা) ঈমান আনিয়াছে তোমরাও তাহাদের মত ঈমান আনয়ন কর, তাহারা বলে, ‘নির্বোধগণ যেরূপ ঈমান আনিয়াছে আমরাও কি সেইরূপ ঈমান আনিব?’ সাবধান! ইহারাই নির্বোধ, কিন্তু ইহারা জানে না **(ইসলামের জন্য ঈমানদারদের জিহাদ, দান সদকা ইত্যাদি নানাবিধ ত্যাগ স্বীকারকে মুনাফিকরা নির্বোধের কাজ মনে করে)**।” (সূরা বাকারা, আয়াত নং ৮-১৩)

   ➧ “(২০৪) আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যাহার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তাহার অন্তরে যাহা আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ভীষণ কলহপ্রিয়।” (সূরা বাকারা, আয়াত নং ২০৪)

   ➧ “যখন তাহাকে বলা হয়, ‘তুমি আল্লাহকে ভয় কর’, তখন **তাহার আত্নাভিমান (অহংকার) তাহাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে**, সুতরাং জাহান্নামই তাহার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয় উহা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।” (সূরা বাকারা, আয়াত নং ২০৬)

   ➧ “তাদের (মুনাফিকদের) উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো; তারপর যখন তার চারিদিক আলোকিত করলো, আল্লাহ তখন তাদের আলো নিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন, যাতে তারা কিছুই দেখতে পায় না।” (সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৭)

   **ব্যাখ্যা:** **তারা ঈমানদারদের সংস্পর্শে থেকে ঈমানের আলো পেয়েছে যার লেশমাত্রও তাদের কাছে ছিল না।** তারপর পার্থিব জীবনে লোভ-লালসা ও কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যায়, এমনকি কুফরী কথা ও কাজে লিপ্ত হয় এবং ঈমানের আলো বঞ্চিত হয়ে সুস্থ জ্ঞান-বিবেক হারিয়ে ফেলে। এভাবে মুনাফিকরা কাফিরদের মধ্যেই শামিল (তবে বিশেষ বৈশিষ্টের কারণে আলাদা নামে অভিহিত) এবং উভয়ের পরিণতি জাহান্নাম। -(তাফসীরে আবু বকর যাকারিয়া, সংক্ষেপিত)

   **➧ “তারা বধির, বোবা, অন্ধ, কাজেই তারা ফিরে আসবে না।” (সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৮)**

   **ব্যাখ্যা:** ইবনে আব্বাস বলেন, এর অর্থ, তারা হেদায়াত শুনতে পায় না, দেখতে পায় না এবং তা বোঝতেও পারে না। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তারা কল্যাণ শুনতে পায় না, দেখতে পায় না এবং বোঝতেও পারে না। সুতরাং তারা হেদায়াতের দিকে ফিরে আসবে না, কল্যাণের দিকেও নয়। ফলে তারা যেটার উপর রয়েছে সেটার উপরই থাকবে। সুতরাং নাজাত বা মুক্তি তাদের নসীবে জুটবে না। কাতাদাহ বলেন, **তারা তাওবাহ করবে না এবং উপদেশও গ্রহণ করবে না।** [আত-তাফসীরুস সহীহ]

   আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, **তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের অন্যত্র স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের বধির, বোবা ও অন্ধ হওয়ার অর্থ তারা তাদের এ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে না।** মহান আল্লাহ্‌ বলেন, **“আর আমরা তাদেরকে দিয়েছিলাম কান, চোখ ও হৃদয়; অতঃপর তাদের কান, চোখ ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি; যখন তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। আর যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত, তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল”।** [সূরা আল-আহকাফ: ২৬] [আদওয়াউল বয়ান]। -(তাফসীরে আবূ বকর যাকারিয়া)

   ➧ “বিদ্যুৎ চমকে তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়ার উপক্রম হয়। যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় তখনই তারা পথ চলে এবং যখন অন্ধকারে ঢেকে যায় তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।” (সূরা বাকারা, আয়াত নং ২০)

   **ব্যাখ্যা:** ইবনে আব্বাস বলেন, এখানে (بَرْقٌ) বলে, কুরআনের অকাট্য আয়াতগুলোকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের অকাট্য আয়াতগুলো বাহকের তীব্র আলো যেন মুনাফিকদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিতে চায়। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

   এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফেকদের সম্পর্কে যে উপমা দিচ্ছেন তার মর্মার্থ হলো- এমন ব্যক্তির উদাহরণ যে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের মধ্যে পথ অতিক্রম করছে, যাতে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের অন্ধকার। রাতের আঁধার, মেঘের আঁধার এবং বৃষ্টির আঁধার। আরও রয়েছে তাতে বিকট শব্দসম্পন্ন বজ্র, বিদ্যুত চমক। এ ভীষণ অন্ধকারে যখন বিদ্যুত চমকায় তখন সে সামনে এগোয়, আবার যখন অন্ধকারে ছেয়ে যায় তখন সে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। **মুনাফেকদেরও ঠিক অনুরূপ অবস্থা, যখন তারা কুরআনের আদেশ-নিষেধ, পুরস্কার ও শাস্তির কথা শোনে তখন তারা নিজেদের কানে আঙুল দেয়। কুরআনের আদেশনিষেধ, পুরস্কার-শাস্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। কারণ এগুলো তাদেরকে বিব্রত করে। তারা এগুলোকে এমনভাবে অপছন্দ করে যেমনিভাবে ঐ ব্যক্তি মৃত্যুভয়ে বজ্রের শব্দকে অপছন্দ করে কানে আঙুল দিত। কিন্তু মুনাফেকরা যত বিব্রতই হোক তারা কোনভাবেই নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে না। কারণ আল্লাহ্‌ তাদেরকে তার জ্ঞান, ক্ষমতা ও শক্তি দ্বারা পরিবেষ্টন করে আছেন।** তারা কোনভাবেই তাঁর হাত থেকে নিস্কৃতি পাবে না বা তাঁকে অপারগও করে দিতে পারবে না। বরং আল্লাহ্‌ তাদের কর্মকাণ্ডের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব করে সে অনুসারে তাদেরকে শাস্তি দেবেন। [তাফসীর আস-সাদী]

   ইবনে কাসীর বলেন, **এই দ্বিতীয় উপমা সেই মুনাফিকদের জন্য যাদের কাছে সত্য কখনো কখনো প্রকাশ হয়ে পড়ে। আবার কখনো তারা সন্দেহে পতিত হয়। সন্দেহের সময় তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে বৃষ্টির মত। এই বৃষ্টি এখানে অন্ধকার অবস্থায়ই বর্ষিত হয়। সে অন্ধকার হচ্ছে, সংশয়, অবিশ্বাস ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব।** তদুপরি তারা থাকে সীমাহীন ভীতিপ্রদ অবস্থায়। সুতরাং **সত্য যখন সে চিনতে পায়, তখন সে তা নিয়ে সে কথা বলে এবং এর অনুসরণও করে, কিন্তু যখন তাদের দোদুল্য মন কুফরের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে যায়।** কেয়ামতের দিনেও তাদের অবস্থা হবে এই যে, যখন লোকদেরকে তাদের ঈমান অনুযায়ী নূর দেয়া হবে, কেউ পাবে বহু মাইল পর্যন্ত, আবার কেউ কেউ তার চেয়েও বেশী, কেউ তার চেয়ে কম, এমনকি শেষ পর্যন্ত কেউ এতটুকু পাবে যে, কিছুক্ষণ আলোকিত হয়ে আবার তা অন্ধকার হয়ে যাবে। কিছু লোক এমনও হবে যে, তারা একটু গিয়েই থেমে যাবে, আবার কিছু দূর পর্যন্ত আলো পাবে, আবার তা নিভে যাবে। আবার এমন **কিছু লোকও হবে যাদের আলো সম্পূর্ণভাবে নিভে যাবে। এরাই হচ্ছে প্রকৃত মুনাফিক,** যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ বলেছেন, **“সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলবে, ‘তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের নূরের কিছু গ্রহণ করতে পারি’। বলা হবে, ‘তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও নূরের সন্ধান কর”।** (সূরা আল-হাদীদ , আয়াত নং ১৩)

   উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়েছে যে, **পবিত্র কুরআনের প্রথম থেকে এ পর্যন্ত মানুষকে কয়েক শ্রেনীতে ভাগ করা হয়েছে। এক. খাঁটি মুমিন।** সূরা আল বাকারার প্রথম চার আয়াতে তাদের পরিচয় দেয়া হয়েছে। **দুই. খাঁটি কাফের।** তাদের বর্ণনা পরবর্তী দুই আয়াতে প্রদত্ত হয়েছে। **তিন. মুনাফিক, যারা আবার দুশ্রেণীর। প্রথম. খাঁটি মুনাফেক। আগুন জ্বালানোর উপমা দিয়ে তাদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয়. সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান মুনাফিক। তারা কখনো ঈমানের আলোকে আলোকিত হয়, কখনো কুফরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।** বজ্র ও বিদ্যুতের উদাহরণ পেশ করে তাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম দলের অবস্থা থেকে তাদের মুনাফেকী একটু নরম। এ বর্ণনার সাথে সূরা আন-নূরের ৩৫ নং আয়াতের বর্ণনার কোন কোন দিকের মিল রয়েছে [ইবনে কাসীর]। এর মাধ্যমে আরও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, **মুমিনরা দু’ভাগে বিভক্ত। এক. সাবেকুন বা মুকাররাবুন, দুই. আসহাবুল ইয়ামীন, আবরার বা সাধারণ মুমিন। আর কাফেররা দু’ভাগে বিভক্ত: এক. অনুসৃত, বা কুফরির দিকে আহবানকারী কাফের দল, দুই. অনুসারী বা অনুসরণকারী সাধারণ কাফেররা। অনুরূপভাবে মুনাফিকদেরও শ্রেণী দুটি। প্রথম শ্রেণীর মুনাফিক হচ্ছে সেসব কট্টর মুনাফিক যাদের অন্তরে ঈমানের লেশমাত্র নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনাফিকের অন্তরে ঈমানের কিছু থাকলেও নিফাকের সব চরিত্র তাদের মধ্যে বিদ্যমান।** [ইবনে কাসীর] (তাফসীরে আবূ বকর যাকারিয়া)

   **➧ “যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর ভঙ্গ করে, আর যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আল্লাহ্‌ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনের উপর ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।” (সূরা বাকারা, আয়াত নং ২৭)**

   **ব্যাখ্যা:** আবুল আলীয়া বলেন, এটি মুনাফিকদের ছয়টি স্বভাবের অন্তর্গত। তারা কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে খেলাফ করে, আমানত রাখলে খিয়ানত করে, সাথে সাথে আয়াতে বর্ণিত তিনটি কাজ, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং যমীনের উপর ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়। [আত-তাফসীরুস সহীহ] (তাফসীরে আবূ বক্‌র যাকারিয়া)

   ➧ “তাহাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার দিকে এবং রসূলের দিকে আসো (একত্ববাদ ও ইসলামী আইন বিধান অনুসরণে), তখন মুনাফিকদেরকে তুমি তোমার নিকট হইতে মুখ একেবারে ফিরাইয়া লইতে দেখিবে। তাহাদের কৃতকর্মের জন্য যখন তাহাদের কোন মুসীবত হইবে, তখন তাহাদের কি অবস্থা হইবে? অত:পর তাহারা আল্লাহর নামে শপথ করিয়া তোমার নিকট আসিয়া বলিবে, ”আমরা কল্যান ও সম্প্রীতি ব্যতিত অন্য কিছুই চাই নাই।” এরাই তারা, যাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ তা **জানেন। কাজেই আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন, তাদেরকে সদুপদেশ দিন এবং তাদেরকে তাদের মর্ম স্পর্শ করে এমন কথা বলুন।”** (সূরা নিসা, আয়াত নং ৬১-৬৩)

   **➧ “তাহাদের মধ্য হতে কাহাকেও বন্ধু ও সহায়রূপে গ্রহণ করিবে না।”** (সূরা নিসা, আয়াত নং ৮৯)

   ➧ “নিশ্চয়ই **যাহারা ঈমান আনে ও পরে কুফরী করে এবং আবার** **ঈমান আনে, আবার কুফরী করে** অতঃপর তাহাদের কুফরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, **আল্লাহ তাহাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদেরকে কোন পথও দেখাইবেন না।** মুনাফিকদের শুভ সংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে। কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো অবতীর্ণ করিয়াছেন যে, যখন তোমরা শুনিবে, আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হইতেছে এবং ইহাকে বিদ্রুপ করা হইতেছে, তখন যে পর্যন্ত তাহারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হইবে তোমরা **তাহাদের সঙ্গে বসিও না অন্যথায় তোমরাও উহাদের মত হইবে। মুনাফিক এবং কাফির সকলকেই আল্লাহ্ তো জাহান্নামে একত্র করিবেন।** দোটানায় দোদুল্যমান- না ইহাদের দিকে, না উহাদের দিকে! এবং আল্লাহ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ পাইবে না। হে মু’মিনগণ! **তোমরা মু’মিনগণের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না।** তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরূদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও? মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকিবে এবং তাহাদের জন্য তুমি কখনও কোন সহায় পাইবে না (যা কোন অমুসলিম বা মুশরিকের ক্ষেত্রেও বলা হয়নি। এটা থেকে বুঝা যায় মুনাফিকরা মানব সমাজের নিকৃষ্টতম জীব।” (সূরা নিসা, আয়াত নং ১৩৭-১৪৫)

   ➧ “তাহাদের জন্য আছে **দুনিয়ার লাঞ্ছনা আর আখিরাতে রহিয়াছে তাহাদের জন্য মহাশাস্তি।** (৪২) **তাহারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং অবৈধ ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত...।**” (সূরা মায়িদাহ্, আয়াত নং ৪১-৪২)

   ➧ “এবং তুমি উহাদেরকে প্রশ্ন করিলে উহারা নিশ্চয়ই বলিবে, “আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করিতেছিলাম।” বল “তোমরা কি আল্লাহ, তাঁহার নিদর্শন ও তাহার রসূলকে বিদ্রপ করিতেছিলে?” **তোমরা দোষ স্খালনের চেষ্টা করিও না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করিয়াছ।** তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করিলেও অন্য দলকে শাস্তি দিব- কারণ তাহারা অপরাধী। (সুরা তওবা, আয়াত নং ৬৫-৬৬)

   ব্যাখ্যা: মক্কা বিজয়ের পর ৯ হিজরীতে রসূল (সাঃ) আবু বাকর, আলী এবং অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)গণকে কুরআনের এই আয়াতসমূহ ও বিধান দিয়ে মক্কা পাঠালেন, যাতে তাঁরা তা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে দেন। তাঁরা নবীর আদেশ মোতাবেক ঘোষণা করলেন যে, কোন ব্যক্তি উলঙ্গ হয়ে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করবে না। বরং আগামী বছর থেকে কোন মুশরিককে বাইতুল্লাহর হজ্জের জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না। [বুখারীঃ নামায ও হজ্জ অধ্যায়, মুসলিমঃ হজ্জ অধ্যায়]। (তাফসীরে আহসানূল বায়ান, সংক্ষেপিত)

   নোট: ৬৬ নং আয়াত থেকে এটি স্পষ্ট যে ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ করার মাধ্যমে প্রকাশ্যে ঈমানের দাবী মূল্যহীন হয়ে গেছে। তাদের কুফরী প্রকাশ হয়ে গেছে। এরপরেও যেসব লোক নিজেদের বূল বুঝতে পেরে তওবা করে খাঁটি মুসলিম হয়ে গেছে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু যাদের ভাগ্যে তা জোটেনি এবং কুফরি ও মুনাফেকির উপর অটল থেকেছে সেসব পাপিষ্ঠ অপরাধীদের তিনি শাস্তি দিবার কথা বলেছেন।

   ➧ “মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারী একে অপরের অনুরূপ। **ইহারা অসৎকর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্ম নিষেধ করে উহারা নিজেদের হাতগুলি (আল্লাহর পথে ব্যয় করা হতে) বন্ধ করিয়া রাখে, উহারা আল্লাহ্কে বিস্মৃত হইয়াছে, ফলে তিনিও উহাদেরকে বিস্মৃত হইয়াছেন;** **মুনাফিকেরা তো পাপাচারী।** মুনাফিক নর, মুনাফিক নারী ও কাফিরদেরকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন **জাহান্নামের অগ্নির, যেখানে উহারা স্থায়ী হইবে,** ইহাই উহাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ্ উহাদেরকে লা’নত করিয়াছেন এবং উহাদের জন্য **রহিয়াছে স্থায়ী শাস্তি।**” (সুরা তওবা, আয়াত নং ৬৭-৬৮)

   ➧ “**মু’মিন নর মু’মিন নারী একে অপরের বন্ধু, ইহারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজ নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করে;** ইহাদেরকেই আল্লাহ কৃপা করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” (সুরা তওবা, আয়াত নং ৭১)

   ➧ “হে নবী! **কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন, তাদের প্রতি কঠোর হোন;** এবং তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল!” (সুরা তওবা, আয়াত নং ৭৩)

   **ব্যাখ্যা:** আয়াতে কাফের ও মুনাফিক উভয় সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করতে এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হতে রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [তাবারী] **প্রকাশ্যভাবে যারা কাফের** তাদের সাথে জিহাদ করার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট যে তাদের বিরুদ্ধে সার্বিকভাবে জিহাদ করতে হবে, কিন্তু **মুনাফিকদের সাথে জিহাদ কিভাবে করতে হবে**। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, **তাদের বিরুদ্ধেও হাত দিয়ে, সম্ভব না হলে মুখ দিয়ে, তাতেও সম্ভব না হলে অন্তর দিয়ে জিহাদ করতে হবে। আর সেটা হচ্ছে তাদেরকে দেখলে কঠোরভাবে তাকানো।** [বাগভী] ইবন আব্বাস বলেন, তাদের সাথে **জিহাদ করার মর্ম হল মৌখিক জিহাদ এবং কোমলতা পরিত্যাগ।** [তাবারী] অর্থাৎ **তাদেরকে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে যাতে করে তারা ইসলামের দাবীতে নিষ্ঠাবান হয়ে যেতে পারে।** দাহহাক বলেন, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ হচ্ছে, কথায় কঠোরতা অবলম্বন। কাতাদা বলেন, এক্ষেত্রে বাস্তব ও কার্যকর কঠোরতাই বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ তাদের উপর শরীআতের হুকুম জারী করতে গিয়ে কোন রকম দয়া বা কোমলতা করবেন না। [বাগভী]

   এখানে বর্ণিত (غلظة) এর প্রকৃত অর্থ হল, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যে আচরণের যোগ্য হবে তাতে কোন রকম কোমলতা যেন না করা হয়। এ শব্দটি (رأفة) এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ হল কোমলতা ও করুণা। [ফাতহুল কাদীর]। (তাফসীরে আবূ বকর যাকারিয়া)

   ➧ “তুমি উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর একই কথা; তুমি **সত্তর বার উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা** করিলেও আল্লাহ্ উহাদেরকে কখনই ক্ষমা করিবেন না। ইহা এই জন্য যে, উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের সঙ্গে কুফরী করিয়াছে। **আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।”** (সুরা তওবা, আয়াত নং ৮০)

   ➧ “উহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তুমি কখনও উহাদের জন্য **জানাযার সালাত পড়িবে না এবং উহাদের কবরপার্শ্বে দাঁড়াইবে না;** উহারা তো আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং **পাপাচারী অবস্থায় উহাদের মৃত্যু হইয়াছে।** সুতরাং **উহাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি** তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে; **আল্লাহ্ তো উহার দ্বারাই উহাদেরকে পার্থিব জীবনে ~~শাস্তি~~ দিতে চান; উহারা কাফির থাকা অবস্থায় উহাদের আত্মা দেহত্যাগ করিবে।”** (সুরা তওবা, আয়াত নং ৮৪-৮৫)

   **➧ “আর তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাহাদেরকে শাস্তি দিবেন। অমঙ্গল চক্র উহাদের জন্য, আল্লাহ্ উহাদের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন এবং উহাদেরকে লা’নত করিয়াছেন এবং উহাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন, উহা কত নিকৃষ্ট আবাস!”** (সুরা ফাতহ, আয়াত নং ৬)

   ➧ “উহারা বলে, “আমরা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান আনিলাম এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করিলাম”, **কিন্তু ইহার পর উহাদের একদল মুখ ফিরাইয়া নেয়; বস্তুত উহারা মু’মিন নয়।** এবং যখন **উহাদেরকে আহ্বান করা হয় আল্লাহ ও তাহার রসূলের দিকে উহাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবার জন্য তখন উহাদের একদল মুখ ফিরাইয়া নেয়।** (সুরা নূর, আয়াত নং ৪৭-৪৮)

   **➧ মু’মিনদের উক্তি তো এই-** যখন তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবার জন্য আল্লাহ এবং তাহার রসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাহারা বলে, **“আমরা শ্রবণ করিলাম ও আনুগত্য করিলাম।”** আর উহারাই তো সফলকাম।” (সুরা নূর, আয়াত নং ৫১)

   ➧ “(১) যখন মুনাফিকরা তোমার নিকট আসে তাহারা বলে, ‘আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল।’ আল্লাহ্ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, **মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।** (২) উহারা উহাদের শপথগুলিকে ঢালরূপে ব্যবহার করে আর উহারা আল্লাহর পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। উহারা যাহা করিতেছে তাহা কত মন্দ। (৩) ইহা এইজন্য যে, **উহারা ঈমান আনিবার পর কুফরী করিয়াছে।** **ফলে উহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেওয়া হইয়াছে; পরিণামে উহারা বুঝে না।** (৬) **তুমি উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই উহাদের জন্য সমান। আল্লাহ উহাদেরকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।** (সুরা মুনাফিকুন, আয়াত নং ১-৬)

   ➧ “যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা কি মনে করে যে, আল্লাহ কখনও উহাদের বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন না?” (সুরা মুহাম্মদ, আয়াত নং ২৯)

   **ব্যাখ্যা: এখানে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদে্ধ মুনাফিকদের হিংসা ও বিদ্বেষের কথা বলা হয়েছে যা আল্লাহ প্রকাশ করে দেন। মিথ্যা, ষড়যন্ত্র, প্রতারণা সহ মুনাফিকদের নানা রকম চারিত্রিক বৈশিষ্টসমূহ আল্লাহ এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যে প্রত্যেক জ্ঞানী / সচেতন ব্যক্তি তা জেনে তাদের দুষ্কর্ম থেকে আত্নরক্ষা করতে পারে। -**(তাফসীরে ইবনে কাছির, সংক্ষেপিত)

   **মুনাফিকদের স্বভাব আচরণ সম্পর্কে হাদীসের বাণী:**

   ➧ রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: চারটি দোষ যাহার মধ্যে বিদ্যমান, সে খাঁটি মুনাফিক; আর যাহার মধ্যে ঐ দোষগুলোর একটি বর্তমান থাকিবে, তাহার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব থাকিবে যে পর্যন্ত না সে উহা পরিহার করে- ক) যখন তাহার নিকট কিছু আমানত রাখা হয় (অর্থ, সম্পদ, দলিলাদি বা কোন দায়িত্ব বা গোপন তথ্য ইত্যাদি) তাহাতে সে খেয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) করে। খ) সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, গ) যখন ওয়াদা করে, ভঙ্গ করে, এবং ঘ) যখন কাহারো সহিত কলহ করে, তখন সে গালাগালি ও অশ্লীল ব্যবহার করে। (বুখারী, মুসলিম)

   ➧ আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলিয়াছেন: মোনাফেকের আলামত হইতেছে তিনটা- যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে; যখন ওয়াদা করে, ভঙ্গ করে এবং যখন তাহার নিকট কোন কিছু আমানত রাখা হয়, তাহাতে সে খেয়ানত করে। (বুখারী, মুসলিম) ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় ইহাও রহিয়াছে যে, “যদিও সে নামাজও পড়ে, রোজা রাখে এবং মনে করে যে, সে মুসলিম।”

   ➧ রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলিয়াছেন: মোনাফেকের উদাহরণ হইতেছে সেই বানডাকা ছাগীর ন্যায় যে দুই ছাগ-পালের মধ্যে থাকিয়া একবার এ পালের দিকে দৌড়ায় আবার ঐ পালের দিকে দৌড়ায়। (মুসলিম শরীফ)

   নোট: দ্বীন ইসলামে তার আস্থা বিশ্বাস না থাকার কারণে মুনাফিক ব্যক্তি যেখানে তার জাগতিক স্বার্থ হাসিল হবে সেখানে যায় এবং ফয়সালা তালাশ করে।

   ➧ হযরত আমীর আর-রামী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) রোগ ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বলেন, মু’মিন ব্যক্তির যখন রোগ হয় তারপর আল্লাহ্ তাকে আরোগ্য দান করে, এতে তার অতীত পাপের ক্ষতিপূরণ হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষণীয় ও সতর্কবাণী হয়ে থাকে। কিন্তু **মুনাফিক আখিরাত থেকে গাফিল**। যখন রোগাক্রান্ত হয় এরপর তাকে আরোগ্য দান করা হয়, **সে এ থেকে উপকৃত হয় না**। তার দৃষ্টান্ত ঐ উটের ন্যায় যাকে তার মালিক বেধেছিলো তারপর ছেড়ে ছিল। অথচ সে বুঝল না যে, কেন তাকে বেধেছিল এবং কেন তাকে ছেড়ে দিল। (মারিফুল হাদীস)

   ➧ যে ব্যক্তি কারো ধন-সম্পদ ও পরিজনের ব্যাপারে ধোঁকা দেয়, সে জাহান্নামী। (মুসলিম শরীফ)

   **মুনাফিকদের ভয়াবহ পরিণাম থেকে নাযাত বা মুক্তিলাভের উপায় সম্পর্কিত আয়াত, হাদীস, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা, উদ্ধৃতি এবং নোট উপস্থাপন করা হলো যা আত্নসংশোধনে সহায়ক:**

   ➧ **আল্লাহ অবশ্যই সেইসব লোকের তওবা কবূল করিবেন যাহারা ভূলবশত মন্দ কাজ করে এবং সত্ত্বর তওবা করে, ইহারাই তাহারা, যাহাদের তওবা আল্লাহ কবূল করেন।** আল্লাহ সর্বজ্ঞ, **প্রজ্ঞাময়। তওবা তাহাদের জন্য নহে যাহারা আজীবন মন্দ কাজ করে, অবশেষে তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হইলে সে বলে, ‘আমি এখন তওবা করিতেছি’।** তাহাদের জন্যও নহে, যাহাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছি।” (সূরা নিসা , আয়াত নং ১৭-১৮)

   ➧ “যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়। এবং যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হইলে স্বীয় মর্যাদার সঙ্গে উহা পরিহার করিয়া চলে। এবং **যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করাইয়া দিলে উহার প্রতি অন্ধ এবং বধিরসদৃশ আচরণ করে না।**” (সূরা ফুরকান , আয়াত নং ৭১-৭৩)

   ➧ “হে মু’মিনগণ! **তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর- বিশুদ্ধ তওবা; তাহা হইলে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলি মোচন করিয়া দিবেন** এবং তোমাদেরকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেই দিন আল্লাহ্ লজ্জা দিবেন না নবীকে ও তাহার মু’মিন সঙ্গীদেরকে, তাহাদের জ্যোতি তাহাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হইবে। তাহারা বলিবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।” (সূরা তাহরীম , আয়াত নং ৮)

   **ব্যাখ্যা:** বিশুদ্ধ বা নিষ্ঠাপূর্ণ তওবা হল, (ক) তওবা একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে। (খ) যে গুনাহ হতে তওবা করা হচ্ছে, তা সত্বর ত্যাগ করতে হবে। (গ) এই গুনাহ করে ফেলার জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে। (ঘ) আগামীতে এই গুনাহ 'আর করব না' বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। (ঙ) যদি এই গুনাহের সম্পর্ক কোন বান্দার অধিকারের সাথে হয়, তবে যার অধিকার নষ্ট হয়েছে, তার সাথে মিটমাট করে নিতে হবে। যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। পক্ষান্তরে কেবল মৌখিক তওবা করার কোন অর্থ হয় না। -(তাফসীর আহসানুল বয়ান, সংক্ষেপিত)

   ➧ কিন্তু যারা তাওবাহ্ করে, নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের দ্বীনকে একনিষ্ট করে (কোনরূপ রিয়া তথা লোক দেখানো ও শোনানোর লেশমাত্র উদ্দেশ্য যার মধ্যে নেই), তারা মুমিনদের সঙ্গে থাকবে এবং মুমিনদেরকে আল্লাহ অবশ্যই মহাপুরস্কার দেবেন। তোমরা যদি শোকর-গুজার\* হও এবং ঈমান আন, তবে তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কি করবেন? আর আল্লাহ (শোকরের) পুরস্কার দাতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা নিসা, আয়াত নং ১৪৬-১৪৭)

   **ব্যাখ্যা:** আয়াতে শোকর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর আসল অর্থ হচ্ছে নেয়ামতের স্বীকৃতি দেয়া ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা এবং অনুগৃহীত হওয়া। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, অনুগ্রহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক পদ্ধতি কি? হৃদয়ের সমগ্র অনুভূতি দিয়ে তার অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয়া, মুখে এ অনুভূতির স্বীকারোক্তি করা এবং কার্যকলাপের মাধ্যমে অনুগৃহীত হওয়ার প্রমাণ পেশ করাই হচ্ছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক উপায়। **এ** **তিনটি কাজের সমবেত রূপই হচ্ছে শোকর।** এ শোকরের দাবী হচ্ছে **প্রথমতঃ** অনুগ্রহকে অনুগ্রহকারীর অবদান বলে স্বীকার করা। অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে অনুগ্রহকারীর সাথে আর কাউকে অংশীদার না করা। **দ্বিতীয়তঃ** অনুগ্রহকারীর প্রতি ভালবাসা, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের অনুভূতি নিজের হৃদয়ে ভরপুর থাকা এবং অনুগ্রহকারীর বিরোধীদের প্রতি এ প্রসঙ্গে বিন্দুমাত্র ভালবাসা, আন্তরিকতা, আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক না থাকা। **তৃতীয়তঃ** অনুগ্রহকারীর আনুগত্য করা, তার হুকুম মেনে চলা, তার ~~নেয়ামতগুলোকে~~ তার মর্জির বাইরে ব্যবহার না করা। -(তাফসীর আবু বকর যাকারিয়া)

   মুনাফিকদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এই চারটি কর্মের প্রতি ঐকান্তিকতার সাথে যত্নবান হবে, সে জাহান্নামে যাওয়ার পরিবর্তে ঈমানদারদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা করার অর্থ হল, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী অন্যায়-অনাচার থেকে বিরত থাকা এবং নেক আমলের প্রতি যত্ন নেওয়া। এটাই হল আল্লাহর নিয়ামতের কার্যতঃ কৃতজ্ঞতা। আর ঈমান (বিশ্বাস) বলতে আল্লাহর তাওহীদ (একত্ব), তাঁর রবূবিয়্যাত (প্রতিপালকত্ব) এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) -এর রিসালাত এবং অন্যান্য দ্বীনী বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। -(তাফসীর আহসানুল বয়ান)

   **প্রখ্যাত দায়ী, গবেষক, হাদীস বিশারদ ও বহুগ্রন্থ প্রনেতা ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহি.) প্রণীত রাহে বেলায়াত গ্রন্থ থেকে কৃতজ্ঞতা ও সন্তুষ্টি সংক্রান্ত আলোচনা:**

   শুক্‌র অর্থ কৃতজ্ঞতা, রিদা অর্থ সন্তুষ্টি এবং কানা’আত অর্থ অল্পে তুষ্টি। এ তিনটি কর্মে মুমিনের মনকে অনুশীলন করতে হবে। এগুলি দুনিয়া ও আখেরাতের অনন্ত নিয়ামতের উৎস।

   আল্লাহ্‌ তা’আলা বলেন, “যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তবে আমি আরো বাড়িয়ে দেব আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তবে আমার শাস্তি বড় কঠিন।” (সুরা ইব্রাহীম, আয়াত নং ৭)

   আমাদের প্রত্যেকের জীবনে অগণিত নিয়ামত রয়েছে আবার অনেক কষ্টও রয়েছে। মানুষের একটি বড় দুর্বলতা আনন্দের কথা তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া কষ্ট বেদনার কথা বারবার স্মরণ করা। এ দুর্বলতা কাটাতে হলে জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই ইতিবাচক হতে হবে। আমরা কখনোই কষ্ট ও ~~অসুবিধাগুলোকে~~ বড় করে দেখবো না। কষ্টের কথা বারবার মনে করে জাবর কাটবো না। **বরং আল্লাহর দেয়া নেয়ামত, শান্তি-সুখ বারবার স্মরণ করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। এ ইতিবাচক ও কৃতজ্ঞতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ।** এ দৃষ্টিভঙ্গি যেকোনো মানুষের জীবনকে শান্তি ও পরিতৃপ্তিতে ভরে দেয়।

   কষ্টের অনুভূতিকে ক্রমান্বয়ে কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে রূপান্তরিত করতে হবে। **আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের মধ্যে কিছু কষ্টের কারণে যদি গুনাহ্‌ ক্ষমা হয় ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় তাহলে অসুবিধা কী? প্রতিটি মানুষের জীবনেই বিপদাপদ আছে।** কাজেই আমার জীবনে তো কিছু অসুবিধা থাকবেই। বিপদ ও সমস্যা তো আরো কঠিন হতে পারতো। **অনেকের জীবনেই তো আমার চেয়েও অধিক কষ্ট আছে। কাজেই আমার হতাশ হওয়ার কিছু নেই।**

   রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “সম্পদে, শক্তিতে, রিয্‌কে তোমাদের চেয়ে উত্তম কারো দিকে যখন তোমাদের কারো দৃষ্টি পড়বে, তখন যেন সে তার চেয়ে খারাপ অবস্থায় যারা আছে তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে।” (বুখারী হা/১৩৫৫, মুসলিম হা/২৯৬৩)

   অতি সামান্য নিয়ামতেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভ্যাস তৈরি করতে হবে। সামান্যতম আনন্দ, তৃপ্তি, ভালো ~~লাগা~~ চারপাশের কারো সামান্যতম সুন্দর আচরণ, সবকিছুর জন্য হৃদয় ভরে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। আল্লাহর সকল নেয়ামতই বড়। ছোট্ট নেয়ামতকে বড় করে অনুভব করলে আল্লাহ্‌ আরও বড় নেয়ামত প্রদান করেন।

   রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, “যে ব্যক্তি অল্পের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে বেশিরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।” (আহমাদ হা ৪/২৭৮, মাজমাউয যাওয়াঈদ ৫/২১৭)

   **জীবনের সকল আনন্দ, সুখ, লাভ, পুরস্কার ইত্যাদি সকল নিয়ামতের কথা প্রসঙ্গ ও সুযোগ পেলে অন্যদেরকে বলতে হবে।** আমরা সাধারণত সুখের বা আনন্দের কথার চেয়ে দুঃখের কথা বলতে বেশি আগ্রহী। আমাদেরকে এর বিপরীত বলার অভ্যাস আয়ত্ত করতে হবে।

   রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, **“আল্লাহর নেয়ামতের কথা বলা কৃতজ্ঞতা এবং তা না বলা অকৃতজ্ঞতা।”** (আহমাদ হা ৪/২৭৮, মাজমাউয যাওয়াঈদ ৫/২১৭)

   **আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার দাবি বান্দার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যদি কেউ আমাদের সামান্যতম সহযোগিতা করেন, তবে আমাদের দায়িত্ব তার প্রতি পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। সম্ভব হলে তাকে প্রতিদান দেয়া, না হলে তার জন্য দোয়া করা এবং তার উপকারের কথা অকপটে সকলের কাছে স্বীকার করা ও বলা।**

   রসূলুল্লাহ্‌ (ﷺ) বলেছেন, **“যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর প্রতিও অকৃতজ্ঞ।”** (তিরমিযী হা/১৯৫৪)

   অন্য হাদীসে তিনি বলেন, **“যদি তোমাদের কাউকে কেউ কোন ভাবে উপকার করে, তবে তোমরা তার প্রতিদান দিবে। যদি তোমরা প্রতিদান দিতে না পারো, তবে তার জন্য বেশি বেশি দোয়া করবে। যাতে অনুভব করতে পারো যে তোমরা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পেরেছো।”** (হাদীসটি সহীহ্‌, আবু দাঊদ হা ২/২৩১, নাসাঈ হা/৫৮৭)

   **নোট: পার্থিব জীবনে কৃতজ্ঞতার শুভ পরিণাম**

   প্রখ্যাত রোমান রাষ্ট্রনেতা, বাগ্মী ও লেখক সিসেরোর মতে, ”কৃতজ্ঞতা শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠতম গুণাবলীর অন্যতম নয় বরং তা সকল গুণাবলীর পিতা মাতা।” বহুসংখ্যক গবেষণা অধ্যয়নে দেখা গেছে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বর্ধিত কল্যাণ ও স্বস্তির সম্পর্ক রয়েছে। যা শুধুমাত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রে নয় বরং জড়িত সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে। যে কারণে কৃতজ্ঞতা শিক্ষাদান ও এর অনুশীলন পৃথিবীর বিভিন্ন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনে পরিণত হয়েছে এবং মনস্তত্ত্ব শিক্ষার পাঠ্যক্রম এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন- যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড, পেনসিলভেনিয়া, মিয়ামি এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। কৃতজ্ঞতা মানুষের জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি ও শান্তির সুবাতাস প্রদানের পাশাপাশি দুশ্চিন্তা, উদ্বে্‌গ-পেরেশানী ও দুঃখ-বিপর্যয় দূরীভূত করতে একান্ত সহায়ক- যা গবেষণায় প্রমাণিত। তাছাড়াও কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে সমাজের মানুষের কল্যাণে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিতে দেখা গেছে। অর্থাৎ তাদেরকে পরার্থবাদী ও সমাজসেবক হতে দেখা যায়। কৃতজ্ঞতা/শোক্‌র অধিকতর সুখ, ইতিবাচক মানসিক অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, স্বাস্থ্যন্নোতি, দুঃখ-কষ্ট মোকাবেলা এবং শক্তিশালী সামাজিক সুসম্পর্ক উপভোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কৃতজ্ঞতা অনুশীলনকারী ব্যক্তিকে বেশি ব্যায়াম করতে এবং কমই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে দেখা গেছে গবেষণায়।

   এ বিষয়ে **বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের কয়েকটি পরামর্শ যা ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞ বা শোকরগুজার মানুষ হতে সাহায্য করবে:**

   ১) কৃতজ্ঞতা অনুশীলনের জন্য যে সব ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানের জন্য আপনি কৃতজ্ঞ তার তালিকা তৈরি করা (যেমন- পরিবার, সৃষ্টিশীল কোন কাজ, সুখ, বৃক্ষ, খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি)।

   ২) কোন ব্যক্তির এক বা একাধিক অবদান যার আপনি প্রভূত মূল্যায়ন করেন বা উপলব্ধি ও উপভোগ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ/নোট রাখা এবং ঐ ব্যক্তির ডেস্কে, গাড়ীতে বা ব্যাগে তা সেটে দেয়া।

   ৩) যে সব ব্যক্তি আপনার জন্য বাস্তবেই চমৎকার কিছু করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে তাদের কাছে চিঠি লেখা ও উপহার পাঠানো।

   ৪) প্রতিদিন এজাতীয় ২/৩ টি বিষয় লিখে রাখা এবং সপ্তাহান্তে তার পর্যালোচনা করা যা আপনাকে কৃতজ্ঞ মানুষ হতে স্মরণ করিয়ে দিবে। এবং শিশুসন্তানদেরকে বাবা-মায়ের দান-অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কৃতজ্ঞ হবার শিক্ষা প্রদান করা।

   (ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত ও পরিমার্জিত)

   \*\* **যে ব্যক্তি উপকার পাইয়া অপকার করে, অপকার তার বাড়ি ছাড়িবে না।** (বাইবেল এর ৩২ নং সংস্করণ, বুক অব প্রভার্ব ১৭:১৩) [↑](#footnote-ref-5)